মহারাজ

শ্রীআশালতা সিংহ

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

উৎসর্গপত্র

শ্রীশ্রীমহারাজ মোহনানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীশ্রীচরণ কমলেষু।

যিনি কীর্ত্তনবিগ্রহ, যিনি সঙ্কীর্ত্তন এবং সঙ্গীতপ্রবাহের মধ্য দিয়া শ্রীনাম প্রচার গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে অভিমানশূন্য শ্রীনিত্যানন্দের মতই এযুগে করিতেছেন যাঁহার জীবনের প্রতিমুহূর্ত্ত প্রতিক্ষণ লোক কল্যাণের জন্যই উৎসর্গীকৃত, এই অতি সামান্য গ্রন্থখানি এবং ততোধিক সামান্য গ্রন্থখানির যাহা কিছু লভ্যাংশ সমস্তই জনকল্যাণের জন্য তাঁহার শ্রীচরণে উৎসর্গীকৃত হইল।
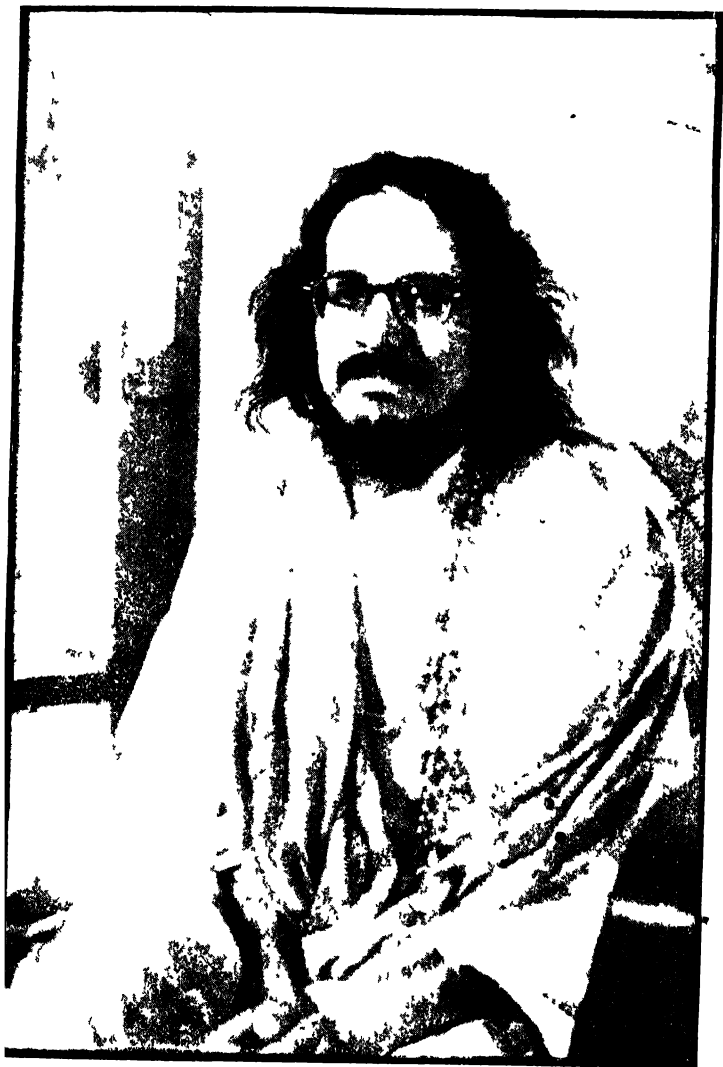
শ্রীশ্রীমহারাজ মোহনানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

ভূমিকা

পরমকারুণিক সাক্ষাৎ শঙ্করাবতার শ্রীশ্রী১০৮ বালানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ নবমবর্ষ বয়সে পিতামাতা গৃহ-স্বজন ত্যাগ করে কঠোব তপস্যায় আজীবন অতিবাহিত করেন। উজ্জয়িনীর দিকে তাঁর জন্মস্থান, তিনি বাঙালী ন'ন। তিনি কেমন করে নর্ম্মদা পরিক্রমা করেন, কেমন করে সেই সুদুর প্রদেশের তপস্বী প্রথমে বৈদ্যনাথধামের তপোপাহাড়ে সাধনায় রত হ'ন, ক্রমে কেমন করে বর্ত্তমান দেওঘরের কেরানীবাদে শ্রীশ্রীরামনিবাস বালানন্দ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয় সে সমস্তই তাঁর জীবনীতে লেখা আছে। শ্রীশ্রীবালানন্দ মহারাজের আদ্যোপান্ত জীবনী ৺শ্রীশ্রীমৎ পূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী প্রণীত পাওয়া যায়। আর এক-খানি জীবনী ৺শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত। শ্রীশ্রীবালানন্দ মহারাজের আধ্যাত্মিক জগতে অশেষ দান, অশেষবিধ কল্যাণকর কার্য্যগুলি আমরা আলোচনা করে ধন্য হই। কিন্তু জগতে সকলের চেয়ে তাঁর বড় দান মহারাজ শ্রীশ্রীমোহনানন্দ ব্রহ্মচারী। যিনি বর্ত্তমানে শ্রীশ্রীবালানন্দ মহারাজের স্থলাভিষিক্ত, দেওঘর আশ্রমের সেবাইৎ এবং ট্রাষ্টী। কিন্তু এসব শ্রীশ্রীমোহনানন্দ মহারাজের বাইরের দিককার

পরিচয়। তিনি আশ্রমের ট্রাষ্টী বললে ভুল বলা হয়, তিনিই আশ্রম বিগ্রহ। শুনতে পাই শ্রীশ্রীবালানন্দ মহারাজ সাক্ষাৎ যোগীরাজ শঙ্কর মূর্ত্তি ছিলেন। তিনি গম্ভীর, রাশভারি। ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দিতে যাতে তাঁর বাঙালী শিষ্যদের বোধগম্য হয় এমন-ভাবে উপদেশ দিতেন। সারা ভারতের তীর্থরাজী পদব্রজে পর্য্যটন করেছেন। অচপল ধীর গম্ভীর যোগীমূর্ত্তি। কিন্তু তাঁর জ্ঞানময় এই বহিরাবরণের ভিতরে তিনি যে অতিমধুর অতি-কোমল হৃদয়টি লুকিয়ে রেখেছিলেন সাত রাজার ধন সেই মানিকটি তিনি বিশ্ববাসীকে অকৃপণভাবে দান করে গেছেন তাঁর মানস পুত্র শ্রীশ্রীমোহনানন্দ ব্রহ্মচারীরূপে। তাঁর এই দানের আড়ালে লুকিয়ে তিনি যেন স্মিত মধুর কৌতুক হাস্য করছেন। যখনই এই দু'জনের কথা একসঙ্গে ধ্যান করি তখনই রবীন্দ্রনাথের "তপোভঙ্গ" কবিতাটি মনে পড়ে ঃ

"হে শুষ্ক বল্কলধারী বৈরাগী ছলনা জানি সব।
সুন্দরের হাতে চাও আনন্দে একান্ত পরাভব
ছদ্ম রণবেশে।
দস্যুতারা হেসে হেসে হে ভিক্ষুক নিল শেষে
তোমার ডম্বরু শিঙ্গা, হাতে দিল মন্দিরা বাঁশরী
তব ধ্যান মন্ত্রটিরে আনিল বাহির তীরে ..."

শ্রীশ্রীমোহনানন্দ মহারাজ যখন মন্দিরা হাতে কনক আসনে কনক ভূষণে কীর্ত্তনের আসরে ব'সেন তখন সত্যিই মনে হয়, বালানন্দ তাঁর ধ্যান মন্ত্রটিকে এইভাবেই বিশ্বকে দান করে

গেছেন এবং তাঁর বাহ্যতঃ রুক্ষ বৈরাগী বেশ একান্ত আনন্দভরে এই চিরসুন্দরের মাঝে আত্মসমর্পণ করে আমাদের কল্যাণের জন্য চির জাগ্রত চির প্রকাশমান হ'য়ে রয়েছেন।

আমাদের মহারাজের সমস্তই গোপন, অতি নিভৃত। তিনি তাঁর দেড় বৎসর বয়সে দেওঘরে একবার মাত্র বালানন্দ মহারাজকে দর্শন করেন। পূজার ছুটিতে তাঁর মা বাবা দেওঘরে এসেছিলেন সেই সময় দেড়বৎসর বয়সের শিশু মোহনানন্দকে তাঁরা শ্রীগুরু চরণ স্পর্শ করান। বালকও সতৃষ্ণ নয়নে একদৃষ্টিতে বালানন্দ মহারাজের দিকে চেয়ে থাকে। এরপর একেবারে সতের বছর বয়সে স্কটিশচার্চ কলেজে যখন তিনি কলা দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়েন এবং অগিল্‌ভি ছাত্রাবাসে বাস করেন, সেই সময়ে একেবারে গৃহত্যাগ করে দেওঘরে শ্রীশ্রীবালানন্দ মহারাজের শ্রীচরণে আত্ম-নিবেদন করেন। এই দেড়বছর আর সতের বছরের মধ্যেকার ইতিহাস নীরব, নিঃশব্দ। এই সময়ের মধ্যে সাধারণভাবে মা বাবার কাছে দেওঘর আশ্রম বা তাঁদের শ্রীগুরুর কথা গল্পচ্ছলে শুনলেও তিনি এই সময়ের মধ্যে কখনও দেওঘর আশ্রম যান নাই বা বড় মহারাজকে দর্শনও করেন নি। সহসা একদিন সমস্ত বিলাস আরাম আনন্দের উপকরণ তৃণবৎ ত্যাগ করে জন্ম-জন্মান্তরের প্রিয়তমের শ্রীচরণে নিজেকে নিঃশেষে দান করেন। অবশ্য জগতের চোখে এই 'সহসা'র অন্তরালে ভগবানের দিব্য-প্রেরণা এবং দিব্য অলক্ষিত সাধনার অনেক ইতিহাস নিশ্চয়

আছে। কিন্তু আমাদের চোখে তা পড়ে না। যাঁদের পড়ে তাঁরা তা বুঝতে পারেন। তাই রবীন্দ্রনাথ সামান্য একটি মাধবী লতার কোলে মাধবী ফুল ফুটে উঠতে দেখে বলেছিলেন ঃ

"এই যে মাধবী মঞ্জরী ফুটিয়াছে আজি
কত শত লক্ষ বরষের সাধনার ধন……"

শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে আছে "অন্তর্য্যামী ঈশ্বরের এই রীতি হয় বাহিরে না কহে, বস্তু প্রকাশে হৃদয়।" তাঁদের দু'জনের মধ্যে ভাষার অতীত বাহ্য প্রকাশের অতীত যে প্রকাশনা নিত্য বর্ত্তমান ছিল তার ইতিহাস তো আমরা জানি না। তারপর মহারাজ এই অতি সুকুমার বয়সে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীরূপে শ্রীশ্রীবালানন্দ মহারাজের শ্রীচরণে আত্ম-সমর্পণ করে কত তিতিক্ষা কত দুঃসহ তপস্যা করেছিলেন, কি ভাবে তাঁর সাধক-জীবন ধীরে ধীরে তাঁর অনন্ত প্রেমময় শ্রীগুরুদেবের অজস্র কৃপাবারিতে পূর্ণ হতে পূর্ণতম হয়, তারও কোন বিস্তৃত ধারা-বাহিক ইতিহাস আমরা জানি না। মহারাজের পিতা ৺হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রীশ্রীবালানন্দ জীবনীতে আমাদের মহারাজের যেটুকু অস্ফুট রেখাচিত্র আছে তা খুবই সামান্য। একটি লাজুক নীরব কঠোর তপস্যারত সুকুমার কিশোর মাত্র। যাঁরা জানতেন তাঁরাও সকলেই প্রায় দেহ রেখেছেন। এই নিভৃত সাধনার ইতিহাসের অনেকদিন পরে যখন যবনিকা উঠে যায়, আমরা শ্রীশ্রীমহারাজকে দর্শন করি তাঁর পূর্ণ গুরুভাবে

প্রকাশের দিব্য মহিমায়। দু'জনে এক হ'য়ে গেছেন। চির শক্তির নির্ঝর চিরায়মান, তার বিরাম নেই বিচ্ছেদ নেই। যন্ত্রমধ্যে যন্ত্রী সেই একই। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলেছিলেন : "আমার মধ্যে দিয়ে মা-ই সব করছেন সব হ'য়েছেন। মাইরি বলছি আমার যদি একটু অভিমানও হয়!"

তেমনই শ্রীশ্রীমহারাজও ভাগলপুরের একটি ভক্তকে লিখেছিলেন : "মা! আমাকে অন্যান্য বারেও অনেকেই দীক্ষা দানের জন্য এখানেই অনুরোধ করা সত্বেও আমার সাহস হইত না। কারণ আমি জানিতাম শ্রীগুরুপীঠে এ শুভকার্য্যে আমি যে শক্তি পাইব তাহা হয়ত অন্যস্থানে পাইব না। কয়েক জনের অত্যন্ত ব্যাকুলতা এবং সাংসারিক আর্থিক কারণে দেওঘর যাইবার অসামর্থ্যতা জানিয়া শ্রীগুরুদেবের চরণে অনুজ্ঞা চাহিয়াছিলাম। তিনি আশ্চর্য্যরূপে ও অলক্ষ্যে আমাকে তাঁহারই এ কার্য্য সাধনে এখানেই নির্দ্দেশ দিয়াছেন। এই যন্ত্রমধ্যে যন্ত্রীরূপে শ্রীগুরুদেব বা ভগবানই নিত্য তাঁর কার্য্য সাধন করিতেছেন, সুতরাং এ ক্ষেত্রে আমার অভিমানও একটু হয় না।" শ্রীশ্রীমহারাজ গানেই তাঁহার যা কিছু দেবার দে'ন, যা কিছু বলবার ব'লেন। সাধারণতঃ দিনের বেলায় এগারোটা থেকে বেলা দুটো পর্য্যন্ত এবং রাত্রিতে ৮টা থেকে এগারোটা পর্য্যন্ত রোজ অন্ততঃ ৬ ঘণ্টা করে তাঁর কীর্ত্তনের সময়। এই কীর্ত্তনের সভা একটি অপূর্ব্ব বস্তু। শ্রীশ্রীমহারাজের রোজ অবিচ্ছেদ এই ৬ ঘণ্টা দর্শন অজস্র নরনারী পায়। আর গানের

ভিতর দিয়ে বিশ্ববাসীকে তিনি যা দান করছেন তার ইয়ত্তা হয় না। তিনি তো মুখে কিছু বলেন না, এই এই সাধন কর, এইভাবে তপস্যা কর তিনি তাঁর গানের ভিতর দিয়ে বুঝিয়ে দে'ন, সব সাধনার সারকথা। কথা দিয়ে নিজেকে আড়াল কোরো না, জীবনদেবতার বেদীমূলে সমস্ত জীবনকে একটি অখণ্ড সুরের মত বাজিয়ে যাও। গানকেই তিনি নিজের যা কিছু দেবার মাধ্যম করেছেন। মহারাজ কীর্ত্তনের আসরে শুধু যে গৌরচন্দ্রিকা সহ মহাজন কীর্ত্তন পদাবলী গান করেন মোটেই তা নয়। বৈষ্ণব পদাবলী, রবীন্দ্রনাথের গান, অতুল প্রসাদের গান, কাজী নজরুলের, রজনী সেনের, মীরার ভজন, রাম-প্রসাদের, ব্রহ্মানন্দের, এমন কোন গান এমন কোন সুর নেই যা তিনি বাদ দেন। মানব মনের অসংখ্য ভাবরাশির যখন যেটি প্রকাশ করতে যে সঙ্গীতের প্রয়োজন হয় সেই গানই তিনি করেন। কীর্ত্তনই তাঁর প্রাণ। শ্রীশ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তন এবং সুর ও সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে নামের রস ঘন স্বরূপের প্রচার, নাম-নামীর অভেদত্ব প্রকাশ এ-ই তাঁর সর্ব্বোত্তম লীলা। এই লীলার সহায়তা এবং পুষ্টির জন্য রবীন্দ্র সঙ্গীত, শ্যামা সঙ্গীত থেকে সুরু করে নরোত্তম দাসের প্রার্থনা শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আস্বাদিত পদ ও শিক্ষাষ্টক গীতা ও ভগবতের সার গীতগুলি এমন কি অতি আধুনিক গান পর্য্যন্ত তিনি বাদ দে'ন না। তারপর তাঁর কীর্ত্তনের আসরের আর একটি বিশেষত্ব তিনি সমস্ত গানই ভাবপ্রধান করে সহজ সুরে গান করেন।

দু'একবার শুনবার পরেই অধিকাংশ দর্শক বা শ্রোতা তাঁর সঙ্গেই গাইতে পারেন। মহারাজ প্রথমে একলাইন গাইলেন, তারপরে সেই লাইনটি দোহার দিয়ে সবাই গাইলেন। এতে তাঁর দিব্য অনুভূতির সঙ্গে একটা সক্রিয় সহযোগ স্থাপিত হ'য়ে অনেকের চিত্তশুদ্ধির সাহায্য করে। মহারাজ কথা ছেড়ে দিয়ে গানকেই কেন তাঁর যা বলার তার যন্ত্র করলেন এ প্রশ্ন মাঝে মাঝে মনে জাগে। এবং যখনই তাঁর কীর্ত্তনের আসরের পূর্ণ অনুষ্ঠানটির কথা আগাগোড়া ভাবি বিস্ময়ে সমস্ত মন ভরে ওঠে। সুরে, ভাবে, রসে সৌন্দর্য্যে এবং শুধু তাই নয়, এক মহা কল্যাণকর চিন্ময় বহিঃপ্রক্ষেপ দিয়ে এই জড় জগতের উপর তা বর্ষিত করে মহারাজ একই সঙ্গে কত শত নরনারীকে ঊর্দ্ধ হতে ঊর্দ্ধাভিসারে অধ্যাত্ম জগতের উচ্চ হতে উচ্চতম স্তরে নিয়ে যাচ্ছেন মনে করলে শ্রদ্ধায় সমস্ত মন ভরে ওঠে। এই যে তিনি রোজ ছ'ঘণ্টা সাতঘণ্টা করে দু'বেলায় কীর্ত্তনের আসরে আসনস্থ থেকে অগণ্য নরনারীকে দর্শন দিচ্ছেন, শুধু এইটুকুরই শক্তি কি কম! স্বামী বিবেকানন্দ রাজযোগে বলেছেনঃ প্রত্যেক ব্যক্তির চতুর্দ্দিকে একপ্রকার জ্যোতিঃ আছে, প্রত্যেক প্রাণীর ভিতর হইতে সর্ব্বদা একপ্রকার আলোক বাহির হইতেছে। পতঞ্জলি বলেন, কেবল যোগীই উহা দেখিতে সমর্থ। আমরা সকলে উহা দেখিতে পাই না বটে, কিন্তু যেমন পুষ্প হইতে সর্ব্বদাই পুষ্পের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম পরমাণু স্বরূপ তন্মাত্রা নির্গত হয়, যদ্দ্বারা আমরা উহার আঘ্রাণ করিতে পারি সেইরূপ

আমাদের শরীর হইতে সর্ব্বদাই এই তন্মাত্রা সকল বাহির হইতেছে। এই কারণেই প্রবল সত্ত্বগুণসম্পন্ন সাধু ও মহাত্মাগণ চারিদিকে ঐ সত্ত্বগুণের তন্মাত্রা বিকিরণ করিয়া তাঁহাদের চতুষ্পার্শস্থ লোকের উপর মহা প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন। মানুষ এতদূর পবিত্র হইতে পারে যে, তাহার সেই পবিত্রতা যেন একেবারে প্রত্যক্ষ দেখা যাইবে—দেহ ফুটিয়া বাহিব হইবে। সেই দেহ যথায় বিচবণ করিবে তথায় পবিত্রতা বিকিরণ করিতে থাকিবে। ইহা কবিত্বের ভাষা নয়, রূপক নয়, বাস্তবিক সেই পবিত্রতা যেন ইন্দ্রিয় গোচর একটি বাহ্যবস্তু বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। ইহাব একটা যথার্থ অস্তিত্ব যথার্থ সত্তা আছে। যে ব্যক্তি এইরূপ চিন্ময় দেহেব সংস্পর্শে আসিবে সেই পবিত্র হইয়া যাইবে।"

মহাবাজের এই চিন্ময় উপস্থিতি তাঁর চতুর্দ্দিকে যে প্রবল আধ্যাত্মিক তরঙ্গের মহাবেগ উপস্থিত করে তার আঘাতে কত শত নর-নারীর যুগ-যুগান্তের জন্মজন্মান্তরের সংস্কার রাশি ভেঙ্গে ভেঙ্গে খান. খান হয়ে যায়। মহারাজ মুখে কোন সাধনার কথা বৈরাগ্যের কথা বলেন না কিন্তু তাঁর উপস্থিতি মাত্রের দ্বারা সেই চিরসুন্দরের প্রতি এমন লোভ জাগিয়ে দেন যে, অন্য কোন বস্তুর প্রতি কামনা আপনা আপনি নির্ব্বাপিত হয়ে আসে। মহারাজ একদিন কীর্ত্তনের আসরে গৈরিক বসন অঙ্গে, মালায় পূর্ণিত বক্ষে, হাতে খঞ্জনি তুলে নিয়ে ভাব

নিমীলিত নয়নে, প্রথমে অতি মৃদু কণ্ঠে আরম্ভ করে একটি গান গাইলেন,

"নিশা অবসানে কে দিল গোপনে আনি
তোমার বিরহ বেদনা মাণিক খানি
সে ব্যথার দান রাখিব পরাণ মাঝে
হারায়না যেন জটিল দিনের কাজে···
বুকে যেন দোলে সকল ভাবনা হানি।"

এটি রবীন্দ্রনাথের একটি গানমাত্র। গীতার অর্থ ব্যাখ্যা নয়, শ্রুতি স্মৃতি বেদ বেদান্ত কিছুই নয়। কলকাতার বালি-গঞ্জের নিকটবর্ত্তী কোন প্রাসাদতুল্য বাড়ীতে আধুনিক সঙ্গীতের আনুষঙ্গিক উপকরণ বেহালা, হার্ম্মোনিয়াম, গীটারের সঙ্গে গাওয়া হ'য়েছিল আধুনিক একটি রবীন্দ্র সঙ্গীত। আপাত দৃষ্টিতে বর্ণনা শুনে মনে হতে পারে এর মধ্যে এমন কী বস্তু আছে যা সহস্র সহস্র নর-নারীকে এক নিমেষের মধ্যে সেই অখিল রসামৃত মধুর মূর্ত্তি পরম কারুণিক শ্রীভগবানের সান্নিধ্য স্মরণ করিয়ে দেয়? কী যে আছে তা তো মহারাজকে দর্শন না করলে উপলব্ধি হয় না। কী যে আছে সুব জড়িয়ে সব নিয়ে এরমধ্যে যে কেবলই মনে হতে থাকে যাঁর মাধুর্য্য সাগরের এক কণাও বর্ণনা করতে না পেরে বিল্বমঙ্গল ঠাকুর "মধুরং মধুরং বপুরস্যবিভো, মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্, মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেত-দেহো মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্ বলে অবশেষে ছেড়ে দিয়েছেন সেই মধুরের প্রতি আমাদের লালসা একান্তই জাগ্রত করে দিয়ে-ছেন মহারাজ তাঁর সঙ্গীত দিয়ে। যুগে যুগে এই লোভ জাগ্রত

করে দেওয়াই ধর্মসাধনার চরম কথা। মহারাজকে এই কীর্ত্তনানন্দের মধ্যে এই সঙ্গীতরস নির্ঝরের মধ্যে দর্শন এবং শ্রবণ করলে আমাদের এই লালসা নিরন্তর বাড়তে থাকে। কি কথা বলচেন তিনি, কথার কিইবা প্রয়োজন? কি বক্তৃতা দেবেন? কি বিধি নিষেধ শোনাবেন, কিসেরই বা প্রমাণ প্রয়োগ করবেন। তিনিই যে সেই, এই কথাটি মর্মের মর্মমূলে বিদ্ধ করে দিতে পারেন সুরের মায়ায় একমাত্র তিনিই। অপরোক্ষ অনুভূতির এইখানেই শ্রেষ্ঠতা। ঐ সেই ত্রিভুবন আকর্ষণকারী প্রভু আর এই আমরা আর্ত্ত পিপাসিত শত শত নর-নারী। পরস্পরের মধ্যে তন্ময় হ'লে পরে প্রমাণ হয় নিষ্প্রয়োজন। কথা দিয়ে যা কখনো বলা যায় না যা বাক্য মনের অতীত মহারাজ তা-ই নিজের রসঘন মূর্ত্তি এবং কণ্ঠের ভাবনিমাজ্জিত সুরের দ্বারা চিত্তে সঞ্চার করে দেন। যদিও যাঁরা তাঁকে দর্শন করেছেন তাঁদের প্রত্যেকেরই মনে হয় একমাত্র শ্রীমন্ মহাপ্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর ছাড়া এত রূপ এত আকর্ষণ যেন আর কারোই নেই তবু মহারাজের শ্রীঅঙ্গের প্রতি অনু পরমানু দিয়ে যেন অহর্নিশি এই একটি বাণী ধ্বনিত হচ্ছে,

"আমি রূপে তোমায় ভোলাবনা
ভালোবাসায় ভোলাব।
আমি হাত দিয়ে দ্বার খুলব না গো
গান দিয়ে দ্বার খোলাব।"

গান দিয়ে দ্বার খোলাবার কাজেই তিনি নিজেকে ব্যাপৃত রেখেচেন। মহারাজের অসংখ্য শিষ্য। তিনি গানের সুরেই তাদের মধ্যে চিরজাগরূক। কথা দিয়ে উপদেশ দিতে গেলে কত ভেদ কত সাম্প্রদায়িকতা কত মতানৈক্য দলাদলি হয়তো উপস্থিত হতে পারত এই বিরাট ভক্ত-মণ্ডলীর মধ্যে। কিন্তু তিনি তাঁর মোহন সুরে সকলকে ডাক দিয়েছেন, সকলকে আকর্ষণ করেছেন। কথা যেখানে আড়াল রচনা করতে পারে, দল গঠন করতে পারে সুর সেখানে কিছুই বলেনা কেবল একটি অসীম আকুলতা ও বিরহ বেদনার গুঞ্জন ধ্বনিত করে আমাদের মনকে এই অতিলালসাজীর্ণ প্রাত্যহিক জীবন থেকে অনেক উর্দ্ধে নিয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীতের এই শক্তি উপলব্ধি করে বলেছেন ঃ—"আমি দেখেচি গানের সুর জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঠিক ভালো করে বেজে উঠলেই এই জন্ম-মৃত্যুর সংসার, এই আনাগোনার দেশ এই কাজ কর্ম্মের আলো আঁধারের পৃথিবীটি বহুদূরে যেন একটি পদ্মানদীর পর পারে গিয়ে দাঁড়ায়। সেখান থেকে সমস্তই যেন ছবির মত বোধ হতে থাকে।" মহামণীষী রোমা রোঁলা তাঁর অমর মহাকাব্য জন ক্রীষ্টোফারে সঙ্গীতের এই লোকাতীত জগদাতীত শক্তি সম্বন্ধে লিখে গেছেন ঃ—

"Life passes. Body and soul flow onward like a stream. The whole visible world of form is for ever wearing out and springing to new life. Thou only

dost not pass, Immortal music! Thou art the inward sea. Thou art the profound depths of the soul. Thou art beyond the world! Thou art a whole world to thyself." "John Christopher, Journey's end."

মহারাজ নিজেও তাঁর কীর্ত্তন সভায় একাধিকবার এই গানটি গেয়ে সকলকে বলেছেন :—

"যারা কথা দিয়ে তোমার কথা বলে
তারা কথার বেড়া গাঁথে কেবল দলের পরে দলে॥
একের কথা আরে
বুঝতে নাহি পারে
বোঝায় যত, কথার বোঝা ততই বেড়ে চলে॥
যারা কথা ছেড়ে বাজায় শুধু সুর,
তাদের সবার সুরে সবাই মেলে নিকট হতে দূর।
বোঝে কি নাই বোঝে
থাকেনা তার খোঁজে
বেদন তাদের ঠেকে গিয়ে তোমার চরণতলে॥"

(রবীন্দ্রনাথ)

তাই আমাদের মহারাজের বিষয়ে কিছু লিখতে যাওয়া খুবই শক্ত। সুরের মায়াকে কি কথা দিয়ে ধরা যায়? কাহিনীর মধ্যে গাঁথা যায়? তাঁর কাহিনীর বাইরেকার প্রকাশ লিখতে গেলে অনেকটা এইরকম দাঁড়ায় :—মহারাজ আজ প্লেনে করে রাঁচি গেলেন। সেখানে তিনদিন থেকে আবার কলকাতায় ফিরে এলেন। কলকাতা থেকে ভাগলপুর

গেলেন। ভাগলপুর থেকে আবার ক'লকাতা হয়ে শিলং গেছেন। শিলং থেকে গৌহাটিতে নামবেন। তারপর দার্জ্জিলিং যাবেন। দার্জ্জিলিং থেকে ক'লকাতা একবার এসে আবার পুরী যাবেন ইত্যাদি। শ্রীশ্রীমন্ মহাপ্রভু সমস্ত ভারতবর্ষেই বিদ্যুৎগতিতে একবার ভ্রমণ করে নিয়েছিলেন জীব উদ্ধারের জন্যে। তাঁর প্রকাশের অবস্থায় পূর্ব্ববঙ্গ যেতে পারেননি তাই সর্ব্ব প্রথমেই টোলের অধ্যাপক অবস্থাতেও একবার পূর্ব্ববঙ্গ ভ্রমণ করে নে'ন। উপলক্ষ্য ছিল, বিদ্যারস বিতরণ। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে তিনি পূর্ব্ববঙ্গের ভূমিতে পদার্পণ করেন সেই ক্ষণ থেকে হরিরস মদিরা বিতরণ করা ছাড়া অন্য কোন কাজ তাঁর ছিল না। শ্রীশ্রীমহারাজ নানা ছলে প্রায় সারা ভারত পর্য্যটন করেছেন। গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে অযাচিত অহেতুক করুণাঘন অপরূপ প্রেমময় মূর্ত্তি অকাতরে হরিনাম বিতরণ করে যাচ্ছেন এ দৃশ্য এ জগতে শ্রীশ্রীমহারাজের ভিতরে পূর্ণমহিমায় দেখতে পাওয়া যায়। জীবকে নাম, রূপ, প্রেম এবং সুরের মায়ায় আকর্ষণ করে ভগবদ্ অভিমুখী করে তোলা তাঁর প্রধান কাজ তাই দেওঘরের আশ্রমে তিনি খুব কমই থাকেন। ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে নানা নগরে বৎসরের অধিকাংশ সময় ভ্রমণ করেন। যে সকল ভাগ্যবান এবং ভাগ্যবতীরা অধিকাংশ সময় তাঁর সঙ্গে ভ্রমণ করেছেন এবং নানাভাবে তাঁর সঙ্গ-সুধা পান করে ধন্য হয়েছেন তাঁরা ভবিষ্যতে নিশ্চয় শ্রীশ্রীমহারাজের

আরও পূর্ণাঙ্গ কাহিনী প্রকাশিত ক'রবেন। আমি সংসারজালে আবদ্ধ নিতান্ত আকিঞ্চনা। অতি অল্প সময় মাত্র তাঁর সঙ্গ করতে পেরেছি। তাঁর জীবনীতে বাইরের দিক থেকে তো বিশেষ লিখবার নেই। তাঁর কীর্ত্তন শুনে তাঁর সঙ্গ করে মনে কি ঢেউ উঠেচে কি কথা জেগেছে, তাঁকে কী মনে হয়েছে, কয়েকদিনের সামান্য দিনলিপিতে তার অতি ক্ষুদ্র অসম্পূর্ণ একটু ছবি মাত্র এখানে এঁকেছি। পূর্ণের কখনো অংশ হয় না, যিনি পূর্ণরসময় চিন্ময় বিগ্রহ, তাঁর সবই পূর্ণ। তাই তাঁর অসীম অলৌকিক জীবন প্রবাহের দুএকটি তরঙ্গের কলগান এখানে ধ্বনিত করে তুলবার চেষ্টা করেছি। মহারাজকে যাঁরা ভালো বাসেন তাঁদের এই ক'টি পাতা প'ড়ে যদি কিছু-ক্ষণের জন্যও তাঁর স্মৃতি মনে পড়ে তাঁর বিরহব্যথার কিছু উপশম হয় তবে আমি ধন্য হব। শ্রীমদ্ ভাগবতে রাস বর্ণনা কালে একটি অদ্ভুত কথা আছে। শ্রীভগবান কৃষ্ণ গোপীদের বলছেন: "হে আমাতে লুব্ধাগণ! তোমরা কি জাননা যে, আমার সাক্ষাৎকার লাভ অপেক্ষা আমার লীলা কথা দ্বারা আমার সহিত মিলন আরও বেশী মধুর?" মহারাজের বিরহ-বেদনা অল্পাধিক সকলকেই সহ্য করতে হয়। কারণ তিনি কত স্থান থেকে স্থানান্তরে দিবারাত্রি ঘুরে ঘুরে জীবউদ্ধার করছেন। এক জায়গা থেকে যখন চ'লে যান তখন নিজেই বিদায়ের গান গাইবার সময় বলেন:—

"এপারে আজ নিভ্‌লো বাতি,
ওপারেতে উজল রাতি।"

এই বিরহ বেদনাকে অতিক্রম করে তাঁর চিরমধুর মিলন সান্নিধ্য অনুভব করতে গেলে আমাদের কায়মনোবাক্যে তাঁর লীলা অনুধ্যান করে মনে প্রাণে উপলব্ধি করতে হবে, তিনি নিত্যকালের বস্তু, তাঁর লীলা নিত্য, তাঁর প্রেম নিত্য, তাঁর সঙ্গসুধা নিত্য। আমরা আমাদের অসম্পূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে খণ্ডিত দেশ কালের মধ্য দিয়ে তাঁকে দেখি। কিন্তু যিনি চিরপূর্ণ, যিনি প্রেমে পূর্ণ, জ্ঞানে পূর্ণ, যিনি মধুরতায় পূর্ণ, যিনি ঐশ্বর্য্যপূর্ণ, সেই পুরুষোত্তমের সমস্তই নিত্য। তাঁর লীলা কথা আরম্ভ করবার আগে তাঁকেই আমরা পরিপূর্ণ হৃদয়ে একবার স্মরণ করে নিই :—

"নিত্যানন্দং পরমপুরুষং শান্তং দান্তং পরহিতরতং
নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যে নিষ্ঠং-নিত্যং সুপ্রসন্নাননং শ্রীমোহনানন্দং
তপসি নিরতং যোগযুক্তং মহান্তং পরম শিবং সদ্গুরুং ত্বং নমামি!

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৫১ মঙ্গলবার সন্ধ্যাবেলায় অধীর আগ্রহে পথ চলেছি। টালিগঞ্জ থেকে বিডন ষ্ট্রীট অনেক দূর। শুধু কি এইটুকু পথের দূরত্ব! "হরি রহ মানস সুরধুনী পারে।" সেই মানস লোকের বাধাই তো বড় বাধা, সেই দূরত্বই যে সবচেয়ে সুদূর। হয়তো এখনই আর কয়েক মিনিট বা আধ ঘণ্টা পরে তাঁর দর্শন পাব। কিন্তু সেই দর্শনকে এই দেহমনের প্রতি অণুপরমাণু অপলকে অতন্দ্র দৃষ্টি মেলে হৃদয়কোষের নিভৃত মণিকোঠায় যত্নে নিভৃতে সঞ্চয় করে রাখতে পারবে তো! মনে পড়ছে ক'লকাতায় আসবার কয়েকদিন আগে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে হোমের সময় যে গানটি গাইছিলেন ব্রহ্মচারিণী মায়েরা তার একটি লাইন ছিল: "যদি দেখতেই পেলাম তোমাকে হে প্রভু, তবে নয়নে কেন নিমেষ দিলে?" যে কোন ভগবদ্ আরাধনার জায়গায় বা ভালো দৃশ্যে গন্ধে গানে মহারাজের স্মৃতিই মনে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ঐ গানটি শুনে হোমের পুণ্য সুগন্ধের সঙ্গে তখনই মনে পড়ছিল সেই মুহূর্তের কথা যখন তাঁর দর্শন পাব অথচ নয়নে অনিমেষ হ'য়ে চেয়ে থাকবার শক্তি থাকবে না। স্বভাবতঃই দেহের নিয়ম অনুসারে নিমেষ পড়বে। শুধু কি তাই? মনের, স্বভাবের কত চঞ্চলতা কত বিক্ষেপ। যদি একমুহূর্তের জন্যও হৃদয় মন

শান্ত করে তাঁর দর্শন করতে পারতাম। যত রাস্তা এগিয়ে আসে তত ভয় হয় যদি এবারেও যেয়ে দেখি তিনি শিলং থেকে আসেন নি। ১২ই ডিসেম্বর তাঁর শিলং থেকে আসবার কথা ছিল। তখন থেকে আমরা রোজ প্রতীক্ষা করছি কবে তিনি আসবেন। আমার ভাই ও আমি একসঙ্গে পথ চলছিলাম। শুভেন্দু তার নাম, সে বললে, এখন কেবল মনে মনে জপ কর। যদি এবারও যেয়ে দেখ বাড়ী অন্ধকার। না, এবার সমস্ত বাড়ী আলোয় আলোকময়, তিনি এসেছেন। মহারাজকে ৪ মাস ৪ দিন পর এবার এই আর কিছুক্ষণ পর প্রথম দেখব। এর আগে শেষ দেখি ২১শে আগষ্ট। যখন তাঁর সঙ্গে ভাগলপুর থেকে ফিরে আসি। তিনি কলকাতা চলে গেলেন, আমরা সাঁইথিয়ায় নেমে গেলাম বীরভূম যাব বলে।

২৫শে ডিসেম্বর, আজ বড়দিন। সন্ধ্যা প্রায় সাড়ে সাতটা, মহারাজ উপরের তেতালার ঘর থেকে নেমে এ'লেন। যখনই তিনি আসেন মনে হয় না যে তিনি কোন একটা দোতালা বা তেতালার ঘর থেকে নেমে এলেন। মনে হয় হঠাৎ যেন তিনি আবির্ভূত হ'লেন। শুধু এইবার নয় বারবর কত জায়গায় কতভাবে তাঁকে দেখেচি সব সময় মনে হয়েছে, সহসা তাঁর আবির্ভাব হ'লো! সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতি যেন নিশ্চল স্তব্ধতায় কম্পমান হ'য়ে প্রতীক্ষা করছিল, সহসা সেই পুরুষোত্তম আবির্ভূত হ'লেন। বারান্দা বেয়ে কীর্ত্তনের আসরে আসছেন, প্রতীক্ষারত শত শত নরনারী তাঁকে প্রণাম করতে লাগলো।

দূরে থেকে তাঁকে দর্শন করছি। গলায় ফুলের মালা নেই। একটি পাতলা ধূসর রঙের আলোয়ান গায়ে রয়েছে, সোনালী চুল, গৈরিক বসন কাঁধের দিকে গ্রন্থি দিয়ে পরা, স্ফটিক আর প্রবালের মালা গৈরিক উত্তরীয়ের অবকাশে দেখা যাচ্ছে। ঈষৎ কৃশ মূর্ত্তি। বহু যুগ আগে যিনি নিজে ক্রুশবিদ্ধ হবেন বলে একদিন অন্ধকার রাত্রিতে দুর্গম পার্ব্বত্য পথ বেয়ে নিজে বিদ্ধ হবার ভারি ক্রুশ কাষ্ঠখানি নিজেই পিঠের উপর বহন করে আনছিলেন হামাগুড়ি দিয়ে, সমস্ত পৃথিবীর পাপ নিজেই যেন বহন করে আনমনা একা শীতার্ত্ত অন্ধকার রাত্রিতে মর্ত্ত্যের পথ বেয়ে চলেছেন। সেই তিনিই আবার আসছেন একটু অন্য-মনস্কমত হয়ে, অলিন্দ বেয়ে নামছেন আর শত শত নরনারী তাঁর গতি রোধ করে পথের দু'পাশে তাঁর চরণে লুটিয়ে পড়ছে। সকলের প্রণাম শেষ হলে কীর্ত্তন আরম্ভ হ'লো। ততক্ষণে ভক্ত প্রদত্ত মালায় তাঁর কণ্ঠ বিভূষিত হয়ে গেছে। মালার স্তূপ রাশি রাশি হয়ে উঠছে ক্রমশঃ। কীর্ত্তন শুনতে শুনতে একটি নিশ্চয় প্রতীতি হ'লো যিনি যিশাশ্খৃাইষ্ট তিনিই আদ্যাশক্তি শ্রীমতী রাধিকা, আবার তিনিই মহারাজ। যিনি একদিন আজকের এই অতি পুণ্যক্ষণে কোন জেলে মালাদের সঙ্গে আবির্ভূত হয়েছিলেন লোকে তাঁকে বোঝেনি, ক্রুশবিদ্ধ করেছিল, তিনি তো নিত্যকালের নিত্যলোকের এই মহাপুণ্য মুহূর্ত্তে তিনি আবার আবির্ভূত হ'য়েছেন। আর একমাত্র জগতের মা শ্রীমতী রাধিকা ছাড়া মহারাজের মত সমস্ত আর্ত্তকে ধারণ

করতে পারে কে? এত পাপীতাপী পতিতকে মায়ের মত নির্ব্বিচারে অবাধে পরমাশ্রয় দেবার মত তিনি ছাড়া আর কে আছে? শ্রীশ্রীচরিতামৃতে তাই শ্রীরাধিকার অনন্ত মহিমা, অনন্ত গুণ বর্ণনা করতে করতে শেষে বলা হয়েছে তিনি সর্ব্ব-জগতের মাতা।

"কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ যাঁর ভিতরে বাহিরে।
যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে॥
কিম্বা প্রেমরসময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
তাঁর শক্তি তাঁর সহ হয় একরূপ॥
কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ত্তিরূপ করে আরাধনে।
অতএব রাধিকা নাম পুরাণে বাখানে॥
অতএব সর্ব্বপূজ্যা পরম দেবতা।
সর্ব্বপালিকা, সর্ব্বজগতের মাতা॥"

বিডন ষ্ট্রীটে ২৫শে ডিসেম্বর থেকে ১লা জানুয়ারী পর্য্যন্ত মহারাজের কীর্ত্তন হয়েছিল। এরই মধ্যে একদিন রাত্রির কীর্ত্তন লোয়ার সার্কুলার রোডে কাশীমবাজারের রাজ বাড়ীতে হয়। এই ক'দিন দুবেলাই খুব কীর্ত্তন জমেছিল। শিলংয়ে নাকি মহারাজ খুব বেড়াতেন। কীর্ত্তন অল্পই হতো। এটা লক্ষ্য করে দেখেছি যখন মহারাজ কিছুদিন কীর্ত্তন অল্প করেন বা বন্ধ রাখেন তার ঠিক পরেই তাঁর কীর্ত্তন অসাধারণ জমে ওঠে। মনে পড়ে গত বছর মহারুদ্র যজ্ঞের সময় দেওঘরের আশ্রমে ছিলাম, সে কী লোকের ভীড়। সেই লোক সংঘট্ট দেখে

মহাপ্রভুর গঙ্গাতীরে বাচস্পতি ঘরে আর কুলিয়ার লোক সংঘট্টের কথা মনে পড়ে যেত। এ কী অদ্ভুত আকর্ষণ একমাত্র কৃষ্ণ ছাড়া এমন আকর্ষণ আর কোথাও সম্ভব কি? মহাপ্রভু নীলাচল থেকে গৌড়ে এসে বাচস্পতির গৃহে গোপনে উঠে অনুনয় করে বলেছিলেন: তুমি আমাকে নির্জ্জনে কয়েকদিন রাখ গঙ্গাস্নান ও জন্মভূমি দর্শন করি। তার পরে আমাকে সঙ্গোপনে মথুরায় প্রেরণ করবে। বাচস্পতি প্রেমাশ্রুজলে ভাসতে ভাসতে গৌরসুন্দরের এই প্রার্থনায় কৃতকৃতার্থ হয়ে তাঁর আদেশমত সমস্ত কার্য্য করবার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু হ'লে হবে কি, সূর্য্যকে কখনো গোপন রাখা যায়!

"অনন্ত অর্ব্বুদ লোক বলি হরি হরি
চলিলেন দেখিবারে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি
সহস্র সহস্র লোক একো নায়ে চড়ে
বড় বড় নৌকা সেইক্ষণে ভাঙ্গি পড়ে
নৌকা যে না পায়, তারা নানাবুদ্ধি করে
ঘট বুকে দিয়া কেহ গঙ্গায় সাঁতারে
চতুর্দ্দিকে সর্ব্বলোক করে হরিধ্বনি
ব্রহ্মাণ্ড ভেদয়ে যেন হেন মত শুনি॥

মহারুদ্র যজ্ঞের সময় দেওঘর রামনিবাস ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে ঠিক তা-ই হয়েছিল। একেই তো কণ্ট্রোলের যুগ, খুব সীমা-নির্দ্দিষ্ট লোকের ছাড়া খাদ্য বস্তু সংগ্রহ করা কষ্ট সাধ্য। তার উপর দলে দলে গৃহীরা এসে আশ্রম পীড়া ঘটাবে, এত লোক

না হলেই তো হ'তো কিন্তু বহুযুগ আগে মহাপ্রভু কত লুকিয়ে বাচস্পতি ঘরে এসে তার চেয়েও লুকিয়ে কুলিয়ায় গিয়ে তবু তো লোকের ভীড় এড়াতে পাবেন নি। অবশেষে হার মেনে দর্শন দিয়েছিলেন ঃ—

"করুণা সাগর প্রভু শ্রীগৌর সুন্দর
সভা উদ্ধারিতে হইয়াছেন গোচর
হরিধ্বনি শুনি প্রভু পরম সন্তোষে
হইলেন বাহির লোকের ভাগ্য বশে
কি সে শ্রীবিগ্রহের সৌন্দর্য্য মনোরম
সে রূপের উপমা—সেই সে কলেবর।"

কৃষ্ণ জগত আকর্ষণ করেন। এমন কি তিনি নিজেই নিজেকে আকর্ষণ করেন। শ্রীশ্রীচরিতামৃতে আছে ঃ

"কৃষ্ণ মাধুর্য্যের এক স্বাভাবিক বল
কৃষ্ণ আদি নর-নারী করয়ে চঞ্চল
শ্রবণে দর্শনে আকর্ষয়ে সর্ব্বমন
আপনা আস্বাদিতে কৃষ্ণ করেন যতন
এ মাধুর্য্যামৃত সদা যেই পান করে
তৃষ্ণা শান্তি নহে, তৃষ্ণা বাড়ে নিরন্তরে

আমাদের আর দোষ কি? মহারাজ নিজের যে কী বিপুল আকর্ষণ তা কি সত্যি বুঝতে পারেন? বুঝতে পারলে কখনও আমাদের দোষ দিতেন না। তাঁর আকর্ষণ এত প্রবল. সত্যি সে কথা তিনি বোঝেন কি? একথাটা কিন্তু আমার প্রায়ই মনে হয়। সেদিন বৈষ্ণব ধর্মের পরম পণ্ডিত শ্রীহরেকৃষ্ণ

মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয় অনুগ্রহ করে আমাদের বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। তাঁকে বললাম, কিছু কৃষ্ণ কথা বলুন। তিনি মহারাজকে দেওঘরের আশ্রমে দর্শন করেছেন। তাঁর বিষয়ে নানা প্রসঙ্গের পর তিনি মহাপ্রভুর সঙ্গে রায় রামানন্দের কৃষ্ণ কথা আলোচনা করতে লাগলেন। যেখানে গোদাবরী তীরে নিভৃতে তাঁরা দু'জনে বসেছেন ও কৃষ্ণ কথা এবং সাধ্য-সাধন তত্ত্বের শেষ সীমানা যেখানে এসে পৌঁছেচেন ঃ—যেখানে রামানন্দ নিজকৃত—

"পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ্যা ভেল
অনুদিন বাঢ়ল অবধি নাগেল।"... ইত্যাদি গানটি

গাইছেন, শেষে মহাপ্রভু স্বহস্তে রামরায়ের মুখ আচ্ছাদিত করে ধরে বলছেন, "আর নয়, চুপকর," সেই স্থানটির ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয় বললেন, আচ্ছা বলত কেন মহাপ্রভু স্বহস্তে তাঁর মুখ আচ্ছাদন করে ধরেছিলেন? কেন তাঁকে আর বলতে দিলেন না। এ সম্বন্ধে কত রকম ব্যাখ্যা আছে, আমার কিন্তু কি মনে হয় জান? ঐ গানটি শ্রীমতীর মানের সময়কার গান। এখন গৌরসুন্দর হচ্ছেন, রসরাজ মহাভাব দুইয়ের মিলিত মূর্ত্তি। রায় রামানন্দ তাঁকে বলছেন, মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য! প্রথমে তোমাকে দেখেছিলাম একটি সন্ন্যাসীর রূপে। কিন্তু এখন দেখচি তুমি তো সন্ন্যাসী নও। তুমি শ্যামকিশোর, কিন্তু তোমার আগে-আগে

তোমাকে আচ্ছাদিত করে একটি কাঞ্চনপুত্তলী সর্ব্বদা সঞ্চরণ করছেন, তাঁরই অঙ্গ কান্তিতে তুমি গৌর।

"পহিলে দেখিলু তোমায় সন্ন্যাসী স্বরূপ
এবে তোমা দেখি মুঞি শ্যাম গোপরূপ
তোমার সম্মুখে দেখি কাঞ্চন পঞ্চালিকা
তাঁর গৌর কান্ত্যে তোমার সর্ব্ব অঙ্গ ঢাকা।"

মহাপ্রভুও ভক্তের কাছে নিজেকে গোপন না করতে পেরে স্বীকার করলেন নিজমুখেঃ "গৌরঅঙ্গ নহে মোর রাধাঙ্গ স্পর্শন।"

আর সেই রাধা যাকে তাকে স্পর্শ করেন না "ব্রজেন্দ্র সুত বিনা তেঁহো না স্পর্শে অন্যজন।"

আবার এদিকে শ্রীমতী রাধার প্রেমে সর্ব্বদাই বাম্যভাব। কখন যে তিনি মান করবেন তা কে জানে। এমন অনেক সময় দেখা গেছে যে শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থিত বৈদুর্য্য মণিতে রাধিকার প্রতিবিম্ব পড়েছে আর শ্রীমতী মান করেছেন তাঁকে অন্য নায়িকা ভেবে। কেননা শ্রীমতীর দেহবোধ বিরহিত প্রেম। তিনি দর্পণে মুখ রেখে যখন কেশ সংস্কার বা অঙ্গরাগাদি করতেন তখন আপন মুখ দেখতেন না, সদাসর্ব্বদা কৃষ্ণচিন্তা হেতু কৃষ্ণমূর্ত্তিই দর্শন করতেন। তাই আপন রূপ কেমন তা তিনি নিজেই জানতেন না। কাজেই কৃষ্ণের বক্ষঃমণিতে আপন প্রতিচ্ছায়া দেখে তাকে অপর নায়িকা ভ্রম করা তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। যাঁর প্রেমে বাম্যভাবের সুধাতরঙ্গ নিশিদিন

উঠছে। সদা কাছে পেয়েও সদা হারাই হারাই ভাব। তিনি কলহান্তরিতা মানের ঐ পদ শুনে যদি অভিমান করে সরে দাঁড়ান তাহলে কী সর্ব্বনাশ হবে ভাবো! মনে মনে কল্পনা করে দেখ:

"তোমার সম্মুখে দেখি কাঞ্চন পঞ্চালিকা
তাঁর গৌরকান্তে তোমার সর্ব্বঅঙ্গ ঢাকা।"

ঐ কাঞ্চন পুত্তলীটি যদি মান করে সরে দাঁড়ান, তাহলে মহাপ্রভু যে আর নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারবেন না, তাঁর শ্যাম গোপরূপ প্রকাশ হয়ে পড়বে। তাই সভয়ে তিনি রাম-রায়ের মুখে কর আচ্ছাদন করে তাকে নীরব করালেন। আর বোলো না। থামো। আর বললে গোপন থাকবে না। শুনতে শুনতে আমার মনে হোল: মহারাজ ঠিক তাই। তিনি কি নিজে জানেন তাঁর স্বরূপের কী অসম্ভব আকর্ষণ। তিনি কি নিজেকে নিজে কখনো দেখেচেন, তাঁরও তো দেহবোধ বিরহিত ভগবৎ প্রেম, নিজেকে তিনি দেখবেন কী করে? এখন আর আমাদের দোষ দিলে হবে কি, কত সময় তো ভাবি বার বার যেয়ে মহারাজকে হয়তো আমরা কত ত্যক্ত করি কিন্তু যেখানে তিনি যান সেখানে অল্প সময়ের মধ্যে সহস্র সহস্র লোক হ'য়ে যায়। এ কী দৈবী মায়া। নিজেই তিনি এই তীব্র আকর্ষণের মূল কারণ, অন্যলোকে কি করবে?

আর এই যে মহারাজ সমস্ত ভারতবর্ষ অবিশ্রান্ত ঘুরে বেড়াচ্ছেন, গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে অবিরল তাঁর কৃপাবারি বর্ষিত

হচ্ছে, তার বাইরের দিকের কারণটা নিশ্চয়ই ত্রিতাপদগ্ধ সংসারী বদ্ধ জীবকুলের নিস্তার ও কল্যাণ করা। কিন্তু আর একটা কারণও আছে। হাতীর বাইরের দাঁতটা শোভা, ভিতরে নিগূঢ় প্রয়োজনের জন্য আরও দাঁত আছে। সেটা নিভৃত হ'লেও, সেটাই আসল।

স্বামী বিবেকানন্দ জ্বলন্ত উল্কার মত গোটা পৃথিবী ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। একদিন তাঁর গুরুভাইদের মধ্যে কথা হচ্ছিল ঃ

শ্রীরামকৃষ্ণ যেভাবে একমাত্র ভক্তির আরাধনা করে পথ দেখিয়ে গেছেন স্বামীজি কেন অন্যপথ নিলেন। এ সব তো তাঁর প্রদর্শিত পথের সঙ্গে মিলছে না। বিবেকানন্দ কিছুক্ষণ শুনে আর থাকতে পারলেন না। অন্য ঘরে যেয়ে দ্বাররুদ্ধ করে দিলেন। খোলা জানালা দিয়ে তাঁর গুরুভ্রাতারা সভয়ে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন, তাঁর সমস্ত মুখ আরক্তিম হ'য়ে গেছে, চোখ দিয়ে অশ্রুধারা বয়ে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পর প্রকৃতিস্থ হ'য়ে তিনি বলতে লাগলেন, "তোমরা কি বুঝতে পার মানুষের প্রাণ যখন ভক্তিতে ভরে ওঠে তখন তার হৃদয় ও স্নায়ুসকল এত নরম হয় যে, তাতে ফুলের ঘা পর্য্যন্ত সহ্য হয় না। তোমরা কি জান যে আজকাল আমি উপন্যাসের প্রেমকাহিনী পর্য্যন্ত পড়তে পারি না! ঠাকুরের কথা খানিকক্ষণ বলতে বা ভাবতে গেলেই ভাবোদ্বেল না হয়ে থাকতে পারি না। সেইজন্য কেবলই এই ভক্তি-স্রোতটা চেপে যাবার চেষ্টা করি, আর জ্ঞানের শিকল

দিয়ে নিজেকে বাঁধতে চাই। তোমরা মনে করেছ যে, কেবল তোমরাই তাঁকে বুঝতে পেরেছ আর আমি কিছুই পারি নি। তোমরা মনে কর জ্ঞানটা একটা নীরস শুষ্ক জিনিষ। তার চর্চ্চা করতে গেলে প্রাণের কোমল ভাবটাকে একেবারে গলা টিপে মারতে হয়। যাও, কে তোমার ভক্তি মুক্তি চায়? কে দেখতে চায় তোমার শাস্ত্রে কি বলেছে? যদি আমি আমার দেশের লোককে তমোকূপ থেকে তুলে মানুষ করে গড়তে পারি তাহলে আমি হাসতে হাসতে সহস্র নরকে যেতে রাজী আছি। শুধু যে নিজের ভক্তি বা মুক্তি গ্রাহ্য না করে পরের সেবা করতে প্রস্তুত আমি কেবল তারই দাস।" স্বামিজী এই জ্বলন্ত প্রেম বক্ষে নিয়ে উল্কার মত দেশে বিদেশে ঘুরিয়ে নিয়ে নিয়ে নিজেকে নিঃশেষে ক্ষয় করেছিলেন। এত উত্তাপ চিত্তে ধারণ করে তাঁর সাধ্য কি ছিল চুপ করে এক জায়গায় বসে থাকবার। ঠিক তা-ই মনে হয় মহারাজের বেলায়। তাঁকে যখন ফাষ্ট ক্লাস ট্রেণের কামরায় একরাশ মোটঘাটের মধ্যে বসে থাকতে দেখি এত মন কেমন করে যে কী বলব। হে প্রভু! এই কি তোমার স্থান! এত অবান্তরতা এত জনতা একি শুধু তোমার নিজেকে ভুলে থাকবার জন্যে? শাস্ত্রে আছে, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের বৈকুণ্ঠের, স্বর্গমর্ত্ত্যের আনন্দ বেদনা রাশি একীভূত করে সমষ্টি করলেও রাধিকার প্রেমোত্থিত আনন্দ-বেদনার লেশমাত্র সমান হয় না।

লোকাতীত মজাণ্ডকোটি গমপিত্রৈকালিকং যৎসুখং।
দুঃখঞ্চেতি পৃথগ্ যদি স্ফুটমুভে তে গচ্ছতঃ কূটতাং
নৈবাভাসতুলাং শিবে তদপি তৎকূটদ্বয়ং রাধিকা
প্রেমোত্থৎ সুখ দুঃখ সিন্ধু ভবয়োর্বিন্দেত বিন্দোরপি।"

"বৈকুণ্ঠগত এবং তাহার চেয়ে অধিক কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডগত অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যত এই ত্রিকালের সমস্ত সুখদুঃখগুলিকে যদি পৃথক দুই স্থলে রাশীকৃত করা যায়, তাহা হইলেও এই উভয় স্তূপ শ্রীরাধার প্রেমোত্থত সুখদুঃখ সিন্ধুর বিন্দুমাত্রও ধারণ করিতে সমর্থ হয় না।"

সেই সৃষ্টিছাড়া আনন্দ আর সৃষ্টিছাড়া বেদনা যাঁকে অহর্নিশি বক্ষে ধারণ করে চলতে হয় তিনি কি করে এক জায়গায় বসে থাকবেন, তিনি কি করে নিজেকে তিলে তিলে নিঃশেষে ক্ষয় না করবেন? এরকম যে হতেই হবে। কিন্তু যা বলছিলাম, বোধ হয় শিলংয়ে কিছুদিন খুব বেড়িয়েছিলেন, বোধ হয় অনেকদিন বেশি কীর্ত্তন করেন নি তাই তাঁর চিত্ত পিপাসু হয়েছিল। তাই বড়দিনের সময়ে বিডন ষ্ট্রীটএর কীর্ত্তনের আসর খুব জমেছিল। প্রথম দু'একদিনের মধ্যে যে গানগুলি গেয়েছিলেন, তারমধ্যে রবীন্দ্রনাথের গীত বিতানের এই গানটি নিজে অনেক জায়গায় পরিবর্ত্তন করে গাইলেন:

"আমার পথে পথে পাথর ছড়ানো
তাইতো তোমার বাণী বাজে ঝরণা ঝরাণো
আমার বাঁশী তোমার হাতে, তোমার বাঁশী আমার হাতে
সপ্তরন্ধ্র ফুটো তাতে, তাই শুনি সুর এমন মধুর
পরাণ ভরানো।
ছাড়া পেলে একেবারে সে যে ছুটতে পারে চারিধারে
তাই তোমার হাতে আমার মন-ঘোড়া লাগাম পরানো।"

সংসারের শত সহস্র বাধা সঙ্কুল কণ্ঠক ছড়ানো পথ বেয়ে আমাদের এই ছুটে আসা কতটুকু ঋণের জন্যে? এত বাধা অবগুণ্ঠনের মধ্য দিয়ে তাঁকে কি পাব? মনে মনে যা ভাবছিলাম এই গানের মধ্যে যেন তিনি তারই উত্তর দিলেন। অনেক সময় অনেককে বলতে শুনেছি, মনে মনে যা ভাবনা করা যায় মহারাজ গানেই তার উত্তর দেন। এটা অবশ্য আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর একটু ভুল কোন থেকে দেখা। ব্রহ্মবিদ্ স্বচ্ছ নির্মল স্ফটিকের মত তিনি বর্ণহীন। আমরা যে রঙের মন নিয়ে তাঁর কাছে যাই সেই স্বচ্ছ মুকুরে তারই প্রতিবিম্ব পড়ে। তিনি আসলে কিন্তু লালও ন'ন নীলও নন। মহারাজ সেদিনও তাঁর শুভজন্ম তিথির ভাষণে বলেছিলেন: "তিনি নিজরূপকে আমাদের ভাবের মধ্য দিয়েই ব্যক্ত করেন, পৃথিবীতে তাই আর কিছুই তিনি অত চান না, তিনি কেবল ভাবের কাঙাল, তিনি ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন। তিনি Objective ন'ন, তিনি Subjective." আবার কয়েক শত বছর আগেও বলে গেছেন:

> "আমার মাধুর্য্য নিত্য নব নব হয়
> স্ব স্ব প্রেম অনুরূপ ভক্তে আস্বাদয়।"

আরও গাইলেন গান:

> "আমার যে সব দিতে হবে সে তো আমি জানি
> আমার যত বিত্ত, প্রভু আমার যত বাণী
> আমার চোখের চেয়ে দেখা, আমার কানের শোনা
> আমার হাতের নিপুণ সেবা, আমার আনাগোনা
> আমার যে সব দিতে হবে সে তো আমি জানি…'

খুব অবাক লাগলো মনের মাঝে যে কামনার অহর্নিশি অনুরণন ঠিক তাই কি গানের সুরে ফিরে আসছে। তারপর গেয়েছিলেন ঃ

"বড় বিস্ময় লাগে হেরি তোমারে
কোথা হতে এ'লে তুমি হৃদি মাঝারে
তোমারে হেরিয়া জাগে স্মরণে
তুমি চির পুরাতন চির জীবনে……"

তারপর মহারাজ গেয়েছিলেন ঃ

"সংসারে মোরে রাখিলে যে ঘরে
সেই ঘরে রব সকল দুঃখ সহিয়া
করুণা করিয়া নিশিদিন নিজ করে
রাখিয়ো তাহার একটি দুয়ার খুলিয়া
মোর সব কাজে মোর সব অবসরে
সে দুযার রবে তোমারি প্রবেশ তরে
সেথা হতে বায়ু বহিবে হৃদয় পরে
চরণ হইতে তব পদরজ তুলিয়া……"

সত্যি কি তিনি কেবল আমাকে লক্ষ্য করেই এ সব গান গেয়েছিলেন? তা'ও কি হয়? তাঁর কাছে তো নাম রূপ নেই। তিনি ভাবময়। তিনি ভাবের ভিখারী। যে ভাব তাঁর ভাব সমুদ্রে যেয়ে কম্পন তুলবে তারই লীলা লহরী জেগে উঠবে চিন্ময় আনন্দ সাগরে। সেখানে আমি তুমি নেই। এও একটা দিক আবার আর একটা দিকও আছে যেখানে কেবল তিনি আর আমি একা।

এমার্সন তাঁর অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক রচনাগুলির এক জায়গায় বলেছেন ঃ

"মানুষ কম কিসে? সে ইচ্ছা করলে ভাবতে পারে কেবল এই দৃশ্যমান প্রকৃতি, এই পৃথিবী নয়, সমস্ত সৌরজগত কোটি ছায়াপথ মায়াপথ অগন্য নক্ষত্র খচিত বিশ্বচরাচর সমস্ত তারই বিকাশের পাদপীঠ।" রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ঃ

"আমার সুরে সুর বেঁধেছে
জ্যোৎস্না বীণায় নিদ্রাবিহীন শশী
আমি নইলে মিথ্যা হোতো সন্ধ্যাতারা ওঠা
মিথ্যা হোতো কাননে ফুল ফোটা।"

স্বামী বিবেকানন্দ জাহাজের ডেকের উপর থেকে জ্যোৎস্না-প্লাবিত উপকূলের দিকে চেয়ে ভাবাবিষ্ট হয়ে বলেছিলেন ঃ

"মেসিনা আমায় ধন্যবাদ দিবে। আমারই হৃদয়ের ধ্যানলীন সুষমা মেসিনাকে এই সৌন্দর্য্য দান করিয়াছে।" তেমনই মহারাজের কীর্ত্তন একদিকে বহুজন সুখায় বহুজন হিতায় বিশ্বকল্যাণের জন্য বিশ্ববাসীর জন্য। একদিকে তা একেবারে Impersonal. কিন্তু এর আর একটি দিক আছে সেটি Intensely personal. রবীন্দ্রনাথ যে বলে গেছিলেন ঃ "বহু জনতার মাঝে তুমি অপূর্ব্ব একা" সেকি এই জিনিষ নয়? একেবারে নৈর্ব্যক্তিক হয়েও প্রগাঢ় রসচেতন একান্তই আমার আপন ধন এরই অনুভূতি কি রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীতের ভাষায় বলে গেছেন ঃ

"লক্ষ তারার আলোর আভায় আমরা দু'জন একা একা।"

এটি আমাদের প্রত্যেকেই প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করি। তা যদি না করতেম তাহলে এই সহস্র সহস্র জনতার মাঝে মহারাজের কাছে দিনের পর দিন আছি। দূরে এসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে রয়েছি। তাঁর অপূর্ব্ব সঙ্গীতরস ধারা শুনছি, কোন মুখের কথা নেই, প্রশ্ন নেই উত্তর নেই তবু সারা দেহ-মনপ্রাণ তাঁর মধুর স্নেহে দয়ায় পূর্ণ হয়ে রয়েছে কেমন করে?

এমন বিরুদ্ধ ও বিচিত্র ধর্ম্মের একত্র সমাবেশ একমাত্র সেই পুরুষোত্তম ছাড়া আর কারো মধ্যেই সম্ভবপর হতে পারে না। মহারাজ যিনি শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সঙ্গে অভিন্ন যিনি সেই রসরাজ মহাভাবের সম্মিলিত রূপ এ কেবল তাঁরই পক্ষে সম্ভব। কীর্ত্তন শুনতে যে শত সহস্র নরনারী একত্রিত হয়েচেন তাঁরা স্পষ্টই অনুভব করেন সকলের সঙ্গে তাঁর সমষ্টিগত সম্বন্ধ থাকলেও প্রতিটি মনের সঙ্গে আবার তাঁর একা একা আলাদা ব্যক্তিগত সম্বন্ধও রয়েচে। আর প্রত্যেকটি লোক সে কথা মনে প্রাণে অনুভব করছে তীব্র গাঢ়রূপে নইলে তারা ভীড়ের চাপে দলিত মথিত হয়ে যেত জনতার মাঝে একজন হয়ে কোন কালে হারিয়ে যেত।

একমাত্র সেই পুরুষোত্তম যিনি তিনিই যুগপৎ একই সঙ্গে এমন বিভিন্ন রূপেতে বিরাজ করতে পারেন। তিনিই এক-মাত্র জগতের অনুতে রেণুতে অনুপ্রবিষ্ট ওতপ্রোত হয়ে থেকেও জগদাতীত। তিনিই বিভু—সর্ব্বব্যাপক আবার ঠিক সেই সময়েই তিনি অনুহতেও সূক্ষ্ম। তিনিই অণোরনীয়ান্ মহতো

মহীয়ান্। অবর্ণ হয়েও শ্যামবর্ণ রক্তান্ত লোচন, আবার তিনিই নিজমুখে বলেছেন, আমি শ্যামবর্ণ, "গৌরঅঙ্গ নহে মোর, রাধাঙ্গ স্পর্শন।" আর সেই তিনিই তো মহারাজ। নইলে এমন আর কিছুতেই সম্ভব হোতনা। যিনি কতদিন আগে নিজের শ্রীমুখে বলে গেছেন ঃ শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে "আমি যৈছে পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মাশ্রয়।"

মহারাজের কীর্ত্তন সভা যে কী জিনিষ আমরা যদি একটু অভিনিবেশ করে দেখি তাহলে অবাক হ'য়ে যাব। মহারাজ এই কীর্ত্তন সভার ভিতর দিয়ে কী করে জ্ঞাতসারে অজ্ঞাতসারে বহুজনের যথার্থ কল্যাণ করছেন, প্রেমে, রসে, রঙ্গে, কল্যাণে সবদিক দিয়ে একসঙ্গে সহস্র সহস্র নরনারীকে অমৃতের তরঙ্গে সিক্ত করছেন। সমস্ত অনুষ্ঠানটির কল্পনা কেবল যে আধ্যাত্মিকতা এবং সৌন্দর্য্যবোধের দিক থেকে অপূর্ব্ব তা নয় খুব Scientificও এ ছাড়া। অনেকে বলেছেন এবং ক্রমশঃ আরও বলছেন যে, মহারাজের অদ্ভুত আকর্ষণে তাঁর ভক্ত এবং শিষ্য এত বেড়ে চলেছে এবং সর্ব্বদাই তাঁর চারিদ্দিকে এত জনতার কোলাহল দু'দণ্ড তাঁর সঙ্গে কথা বলা অসম্ভব। তাঁকে কাছে পাওয়া তারচেয়েও অসম্ভব। কিন্তু এটা আমাদের ভ্রান্ত অপূর্ণ মনের ক্ষোভ মাত্র। কথা বলার কি দাম রয়েছে। মহারাজ যা দিতে চা'ন তা বাক্যের অতীত। সুরের ভিতর দিয়ে তার সঞ্চার হয়। অত লোককে আলাদা আলাদা করে কথা বলে অনেক সময় যায়, কিন্তু সুরে একই সঙ্গে বিশ্ববীণায়

এমন কম্পন জেগে উঠবে যাতে শত সহস্র নরনারী নিজের নিজের চেতনার কম্পনের সঙ্গে তাদের মিল খুঁজে পাবে। শ্রীচরিতামৃতে আছে ঃ

"যে মন্ত্রেতে যে বৈষ্ণব ইষ্টধ্যান করে
সেইমত দেখায় ঠাকুর বিশ্বম্ভবে।"

এ তো আর মিথ্যা নয়। মহারাজের কীর্ত্তন সভায় তাঁর গান তাঁর সুর প্রত্যেকের ভাব অনুযায়ী চিত্তে কম্পন তোলে। একটি পূর্ণচন্দ্র আকাশে ওঠে, ক'লকাতার লোকেও তার জ্যোৎস্না প্রাসাদের অলিন্দে বসে উপভোগ করছে, দীনের কুটীরেও সেই একই আলো অকৃপণ দাক্ষিণ্যে ছড়িয়ে রয়েছে। তারপর কীর্ত্তনের আসরে মহারাজ একাসনে বসে ঐ যে তিন ঘণ্টা চার ঘণ্টা একাদিক্রমে শত শত নরনারীকে দর্শন দান করেন তার অমোঘ শক্তি যে কী তা কি কখনো আমরা ভেবে দেখেচি? স্বামী বিবেকানন্দ রাজযোগে বলে গেছেন ঃ

"সূক্ষ্মভূত তন্মাত্রা—এই তন্মাত্রা সাধারণ লোকে উপলব্ধি করিতে পারে না। কিন্তু পতঞ্জলি বলেন, যদি তুমি যোগাভ্যাস কর, কিছুদিন পরে তোমার অনুভব শক্তি এতদূর সূক্ষ্ম হইবে যে, তুমি তন্মাত্রাগুলিকে বাস্তবিক প্রত্যক্ষ করিবে। তোমরা শুনিয়াছ প্রত্যেক ব্যক্তির চতুর্দ্দিকে একপ্রকার জ্যোতি আছে, প্রত্যেক প্রাণীর ভিতর হইতে সর্ব্বদা একপ্রকার আলোক বাহির হইতেছে। পতঞ্জলি বলেন, কেবল যোগীই উহা দেখিতে সমর্থ। আমরা সকলে উহা দেখিতে পাই না বটে, কিন্তু যেমন পুষ্প

হইতে সর্ব্বদাই পুষ্পের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম পরমাণুস্বরূপ তন্মাত্রা নির্গত হয়, যদ্বারা আমরা উহার আঘ্রাণ করিতে পারি। সেইরূপ আমাদের শরীর হইতে সর্ব্বদাই এই তন্মাত্রা সকল বাহির হইতেছে। প্রত্যহই আমাদের শরীর হইতে সর্ব্বদাই এই তন্মাত্রা সকল বাহির হইতেছে। প্রত্যহই আমাদের শরীর হইতে শুভ বা অশুভ কোন না কোন প্রকারের রাশীকৃত শক্তি বাহির হইতেছে, সুতরাং আমরা যেখানেই যাই চতুর্দ্দিকে এই তন্মাত্রায় পূর্ণ হইয়া যায়। এই কারণেই প্রবল সত্ত্বগুণ সম্পন্ন সাধু ও মহাত্মাগণ চতুর্দ্দিকে ঐ সত্ত্বগুণের তন্মাত্রা বিকিরণ করিয়া তাঁহাদের চতুষ্পার্শ্বস্থ লোকের উপর মহাপ্রভাব বিস্তার করিতে পারেন। মানুষ এতদূর পবিত্র হইতে পারে যে, তাহার সেই পবিত্রতা যেন একেবারে প্রত্যক্ষ দেখা যাইবে—দেহ ফুটিয়া বাহির হইবে। সেই দেহ যথায় বিচরণ করিবে তথায় পবিত্রতা বিকিরণ করিতে থাকিবে। ইহা কবিত্বের ভাষা নয়, রূপক নয়, বাস্তবিক সেই পবিত্রতা যেন ইন্দ্রিয়গোচর একটি বাহ্য বস্তু বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। ইহার একটা যথার্থ অস্তিত্ব যথার্থ সত্তা আছে। যে ব্যক্তি এইরূপ চিন্ময় দেহের সংস্পর্শে আসিবে সেই পবিত্র হইয়া যাইবে।"

মহারাজ এই যে প্রতিদিন দু'বেলার কীর্ত্তন সভায় একাদি-ক্রমে তিন চার ঘণ্টা একাসনে ব'সে শত সহস্র নর-নারীকে দর্শন দিচ্ছেন তার শক্তি কি কম! কি হবে কথায়? তাঁর চিন্ময় অস্তিত্বের চারিদিক থেকে যে প্রচণ্ড শক্তি অনুক্ষণ বিকীর্ণ

হচ্ছে তা অবিশ্রান্ত আঘাত করছে, আমাদের যুগ-যুগান্ত জন্ম-জন্মান্ত সঞ্চিত সংস্কার রাশির উপর। আঘাত হানছে, ক্রমশঃ তাদের কৃষ্ণচরণে অভিমুখিনতা নিয়ে আসছে। আমরা তাঁর এই কাজ না বুঝে অনেক বাধা দিই, জগন্নাথ জগত ছাড়া নন। তিনি জগতের কল্যাণ করছেন, সেই সঙ্গে আমারও কল্যাণ হচ্ছে। দু'টো কি আলাদা জিনিষ? কীর্ত্তনের সভায় যখন তিনি এসে ব'সেন, যে মুহূর্ত্তে তিনি আসনস্থ হ'য়ে খঞ্জনী হাতে তুলে নে'ন তখন বেশ বুঝতে পারা যায় অন্য একটা জগতের সঙ্গে তিনি সংযুক্ত হয়ে গেলেন। সেখানকার স্পন্দন তিনি এই জগতে ছড়িয়ে দেবেন, সে জগতের আলো গানের সুরের মধ্য দিয়ে সঞ্চার করে দেবেন এই জগতে, এই জগতের জীব-কুলের মধ্যে। তখন তাঁর শ্রীমূর্ত্তি দেখে শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবতের একটি লাইন কেবল ঘুরে ফিরে মনে পড়ে! "জ্যোতির্ম্ময় কনক বিগ্রহ দেবসার।"

মহারাজের তখনকার মধুরতা বা তখনকার রূপ কেবল এই একটি লাইন্ যেন ব্যক্ত করতে পারে। বার বার ঘুরে ফিরে মনে হয় "জ্যোতির্ম্ময় কনক বিগ্রহ দেবসার।" সত্যিই তাই। এমন অবস্থাতেও আমরা ধীরভাবে তন্ময় একাগ্র হ'য়ে তাঁর এই চিন্ময় বহিপ্র্রক্ষেপকে নিজের কাজ করবার অবকাশ কেন দিই না? হুড়োহুড়ি করে তাঁর চরণ স্পর্শ করে তাঁর গলায় মালা দিয়ে তাঁকে প্রণাম করে অতিব্যগ্রতায় মনে করি নিজের খুব কল্যাণ করলাম।

জ্যোতিময় কনক-বিগ্রহ দেবসাব।

দিন এবং রাত্রির মোহানায় যেমন পুণ্য গোধূলি লগ্ন, অতি পবিত্র প্রদোষের ছায়ালোকময় আলো-অন্ধকারের সন্ধিক্ষণ ; তেমনই মহারাজ যখন কীর্ত্তনের আসনে যোগযুক্ত হয়ে বসেন, যখন গোধূলি বেলার মত এপারের আর ওপারের সংমিশ্রিত অপরূপ আলোক জ্বালে তাঁর স্তব্ধ মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত হ'য়ে ওঠে, যখন তিনি ওপারের সঙ্গীতের সুর তাঁর অহেতুকী করুণায় ধরে নিয়ে বিতরণ করে দিতে চা'ন এপারে, তখনও, হে অশান্ত ! হে অধীর ! আমরা কেন পারি না নির্ব্বাক মৌন প্রতীক্ষায় তাঁর এই করুণার স্রোতকে অবাধে আমাদের কাছে বেয়ে আসতে দিতে ? কেন প্রণামের ব্যগ্রতায়, গোলমালে তাঁকে, বাধা দিই ?

* * * *

আজ রাত্রির কীর্ত্তন কাশীম বাজারের রাজবাড়ী লোয়ার সার্কুলার রোডে। শুভেন্দুকে অনেকক্ষণ থেকে তাড়া দিয়েছি, নতুন জায়গা খুঁজে যেতে হবে, একটু যেন তাড়াতাড়ি তৈরী হয়। শ্রীশ্রীমহারাজ ২৫শে ডিসেম্বর শিলং থেকে তাঁর ভক্ত ৭৫বি, বিডন ষ্ট্রীটস্থ শ্রীযুত পার্ব্বতী প্রসন্ন ঘোষ ব্যারিষ্টারের গৃহে শুভাগমন করেন এবং ২রা জানুয়ারী পর্যন্ত তথায় অধিষ্ঠান করে শুভ জন্মোৎসব জন্য আঠারো বাড়ী হাউসে গমন করেন। বিডন ষ্ট্রীটে কীর্ত্তন শুনতে যাবার সময় আমরা সারাদিনই প্রায় বাইরে থাকতাম। কোন কোন দিন দিনের কীর্ত্তন শুনে বাড়ী ফিরতে পাঁচটার কাছাকাছি হ'য়ে যেত, আবার সাড়ে ছ'টার

সময় বার হতাম। বাড়ী ফিরতে প্রায় রাত্রি বারোটা হ'য়ে যেত। অধ্যাপক শুভেন্দুর কলেজের অঙ্কের খাতাগুলি তাই একটিও দেখা হয়নি। আজ দিনের বেলায় একটু আগে ফিরে খুব অভিনিবেশ করে অঙ্কের খাতা দেখছিল। আমার হাত থেকে চায়ের পেয়ালা নিয়ে খাতা দেখা বন্ধ করে সহর্ষমুখে বললে, এতক্ষণ মহারাজকে ভুলে ছিলাম, এখন কাজ শেষ করে হঠাৎ খুব আনন্দ হচ্ছে এই আর একটু পরেই তো তাঁকে দেখতে পাব।

আমি বললাম: বাবে, এরকম একটা অসম্ভব কথা, মহারাজকে আমরা ভুলতে পারি নাকি? অর্থাৎ আমাদের কি তাঁকে ভুলবার যো আছে! মনে করেছি হয়তো তাঁকে ভুলেছি কিন্তু কখনো ভুলিনি। তিনি মনেই আছেন।

প্রফেসর সায়েব বল্লেন: মেয়েদের কাজ অন্যরকম। তারা পান সাজতে, আনাজ কুটতে কুটতে, রান্না করতে করতে মহারাজের কথা সর্ব্বদা ভাব্‌তে পারে কিন্তু আমাদের কাজ তা নয়। এতটা ব্রেণের Concentration করতে হয়, শক্ত আঁক দেখবার সময় আর বোঝাবার সময় যে, মহারাজের কথা মনে থাকে না। অঙ্কটা শেষ করে মনে পড়ে। সেই মুহূর্ত্তে মনে থাকে না। আমি বললাম, এ একটা কথাই নয়। 'বলাকা' রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক কবিতার অপূর্ব্ব বই। 'বলাকা'র একটা কবিতায় তিনি লিখেচেন:

"তোমায় কি গিয়েছিনু ভুলে
তুমি যে নিয়েছ বাসা জীবনের মূলে
তাই ভুল ?
অন্যমনে চলি পথে ; ভুলিনে কি ফুল
ভুলিনে কি তারা ?
তবুও তাহারা
প্রাণের নিশ্বাস বায়ু করে সুমধুর
ভুলের শূন্যতা মাঝে ভরি দেয় সুর
ভুলে থাকা নয় সে তো ভোলা
বিস্মৃতির মর্ম্মে বসি রক্তে মোর দিয়েছ যে দোলা !—"

মোটের উপর আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমরা কিছুতেই এক নিমিষের জন্যও মহারাজকে ভুলতে পারি না। কারণ "ভুলে থাকা তো আর ভোলা নয়।" যিনি আছেন বলে আমরাও আছি তাঁর সম্বন্ধে একেবারে স্মৃতিহীন হ'লে তো আমাদের অস্তিত্বই সম্ভব নয়। অনেক উত্তেজনার মুহূর্ত্তে অনেক মানসিক বিপর্য্যয়ের সময় নিঃশ্বাস পড়ছে কি না স্মরণ থাকেনা, কিন্তু সে তার কাজ ঠিকই করে চলেছে নইলে আমরা মরে যেতাম। কত যুগ-যুগান্তর কত জন্ম-জন্মান্তর কত ভাবে চেতনায় কত নিম্নস্তরে কত নীচ প্রাণী হয়েও হয়তো কাটিয়েছি, কিন্তু তাঁর স্মৃতি কোন না কোন আকারে নিশ্চয়ই ছিল। নিশ্চয়ই অঙ্ক কষতে যেয়ে ভুলে যাইনি। চাইনে ভাই তোর মত বিদ্যাদিগ্‌গজ প্রফেসর হতে, আমাদের পান সাজা রান্না করাই ভালো। আমরা সারাদিন ঘরের কাজ করতে করতে তাঁকে স্মরণ মনন করতে পারি। তবু লোকে মেয়েদের এত দোষও দেয়।

সন্ধ্যা সাতটার মধ্যে আমরা কাশীম বাজারের রাজ বাড়ীতে পৌঁছে গেলাম। খুব চমৎকার কীর্ত্তনের আসর হ'য়েছিল। মহারাজের আসনের কাছেই একটি তুলসীগাছ, সচন্দন পুষ্পমাল্যে তুলসীবৃক্ষ ভূষিত। চন্দনের বাটিতে চন্দন নিয়ে মহারাজের শ্রীচরণে স্পর্শ করিয়ে সেই চন্দন সকলকে দেওয়া হোল। প্রতিমার সুমুখে যেমন বড় বড় ধূপদানিতে করে সুগন্ধী ধূপ ধুনা গুগ্‌গুল দেওয়া হয় তেমনই বড় বড় ধূপের সরায় করে ধূপ দেওয়া হচ্ছিল। খুব বড় হ'ল, উজ্জ্বল আলো, সামনে লাউডস্পীকার দেওয়া হয়েছিল। —মা আপত্তি করে অনেক চেষ্টা করলেন যাতে লাউডস্পীকার সরিয়ে দেওয়া হয়। বললেন, ওতে মহারাজের গানের ভাব নষ্ট হয়ে যায়, মেকানিক্যাল্ জিনিষ, সুর শুনতে যান্ত্রিক লাগে। পাড়াটা খারাপ মুসলমান এসে জড় হয়ে যাবে। আমি মুগ্ধ হ'য়ে শুনছিলাম তাঁর কথা। সত্যি এই মায়েদের কত জন্মান্তরের তপস্যা, মহারাজের উপর তাঁদের কী অদ্ভুত মমতা বুদ্ধি। পাড়াটা খারাপ, মুসলমান জড় হবে—অপূর্ব্ব মমতায় তাঁরা এসব আশঙ্কারও কথা ভাবছেন। যিনি পারের কাণ্ডারী তিনি কি আর রাজাবাজার' আর লোয়ার সার্কুলার রোডে মুসলমান জড় হ'য়ে গেলে সেটা মানিয়ে নিতে পারবেন না। তাছাড়া এখন ও সব আসছেই বা কোথা থেকে। এখনতো কলকাতার অবস্থা একেবারে উল্‌টো। আর যান্ত্রিক সভ্যতার সমস্ত যান্ত্রিক

পরিবেশ মেনে নিয়েই তো মহারাজ নিশিদিন তাঁর অমল করুণা ধারা বিতরণ করে চলেছেন। যিনি একদিন ঝারিখণ্ডের বনপথ দিয়ে একান্ত নিঃসঙ্গ নির্জ্জনতায় আনন্দে অধীর হয়ে বন্য শাক ও ফলমূল নিবেদন করে গ্রহণ করতে করতে বৃন্দাবন গেছিলেন আজ তিনি প্লেনে করে এরোড্রোমে নেমে দেশ দেশান্তরে যাচ্ছেন। যখন যেমন তখন তেমন ভগবানের একটি রীতি। লাউডস্পীকার না সরানো সত্ত্বেও মহারাজের কীর্ত্তন অসাধারণ জমে উঠ্‌লো। সেদিন মহারাজ যখন গাইছিলেন ঃ

"ওহে জীবন বল্লভ, ওহে সাধন দুর্লভ
আমি মর্ম্মের কথা অন্তরব্যথা কিছুই নাহি কব
শুধু জীবন মন চরণে দিনু, বুঝিযা লহ সব।
আমি কী আর কব
এই সংসার পথ সংকট অতি কনটক মম-হে
আমি নীরবে যাব হৃদয়ে লয়ে প্রেম মুরতি তব
আমি কী আর কব—"

তখন অতিমধুর অতি রসোজ্জ্বল তাঁর শ্রীমূর্ত্তির দিকে অনিমেষে চেয়ে আমরা নিশ্চল হ'য়ে ব'সেছিলাম। বিশেষ করে তিনি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যখন বার বার গাইছিলেন, "ওহে জীবন বল্লভ ওহে সাধন দুর্লভ—" তখন সত্যি প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি হচ্ছিল ঃ সাধনার অভিমানে কেউ তাঁকে কোনদিন পায়না, তিনি সাধন দুর্লভই নিশ্চয়। একমাত্র তিনি যদি কৃপা করে ধরা দেন, তিনি যদি বরণ করে নেন তবেই তাঁকে পাওয়া যায়।

"নাযমাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ ন মেধয়া ন বহুনাশ্রুতেন—
যমে বৈষঃ বিবৃনুতে, তে নৈষঃ লভ্যস্তমৈষ 'আত্মা বিবৃনুতেতনু' স্বাম্।"

একমাত্র তিনি যাকে আপন অহেতুকী করুণায় বরণ করে নেবেন সেই তাঁকে পাবে। তাঁর কৃপাই তাঁকে পাবার একমাত্র উপায়। অন্য উপায় নেই। কিন্তু একথাটা যদি মহারাজ বক্তৃতায় বলতেন, নানা শাস্ত্রীয় যুক্তি এবং উক্তি আহরণ করে বলতেন, আমবা শুনতাম আবার ভুলে যেতাম কিন্তু তিনি যে উপায়ে ব'লছেন তা কি ভুলবার ?

তিনি যে সেই 'সাধন দুর্লভ'কে সেই চির আকাঙ্ক্ষার চির কামনার চির অপ্রাপ্য ধনকে তাঁব গানের সুরে তাঁর কমলসম নিমীলিত আঁখির ভাব মুগ্ধতায় আমাদেব চোখের সামনে একেবারে শরীরী করে এ'নে উপস্থিত করছেন। এই তো সেই সাধনার ধন ! যিনি নিজে ধরা না দিলে কোন সাধনাই তাঁকে ধরতে পারে না। তাঁকেই আমবা মন্ত্রমুগ্ধের মত দর্শন করছি। যে মন্ত্রে আমরা মুগ্ধ হলাম সেটি হচ্ছে সুর আর সুরময় প্রেমের ইন্দ্রজালে একীভূত হ'য়ে গেছেন।

তারপর মহারাজ গাইলেন ঃ

"অন্য অভিলাষ ছাড়ি' বৃথাতর্ক পরিহরি, কায়মনে গোবিন্দ ভজন
সাধুসঙ্গে ইষ্টসেবা একনিষ্ঠ রাখে যেবা, এই ভক্তি পবম কারণ
কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য দম্ভসহ,
শ্রীকৃষ্ণ চরণে আমি অর্পণ করিব

আনন্দ করিয়ে পান, রিপু করি বলিদান, অনায়াসে গোবিন্দ ভজিব
কামেরে করিব অর্পণ কৃষ্ণ কামনায়, ভক্তদ্বেষী জনে ক্রোধ রাখিব সদাই
সাধুসঙ্গ হরি কথায় লোভ কবে হবে, কৃষ্ণরূপে মুগ্ধ মন হয়ে সদা রবে
শ্রীকৃষ্ণ দাসত্ব আমি কভু না ছাড়িব, ভক্তিধনে ধনী হ'য়ে মাৎসর্য্য ত্যজিব

কামনার এই মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া সব শাস্ত্রেই অল্পবিস্তর বলে। মহারাজ কখনও বলেন না ত্যাগ তপস্যার কথা। বরঞ্চ তিনি প্রায়ই বলেন গানের সুরে, 'দুধ পিনেসে হরি মিলে তো বহুত বৎসবালা' সাধন ভজন করে তাঁকে পাওয়া যায়না, তাঁর কৃপা ছাড়া। বরঞ্চ উৎকট তপস্যা বা সাধন ভজনের একটা অহঙ্কার আছে। আমি এত জপ করছি আমি হোম করছি আমি স্বাধ্যায় করছি। টাকা কড়ি মান যশ স্থূল অহঙ্কার, আর এও একরকম অহঙ্কার, সূক্ষ্ম অহঙ্কার। সূক্ষ্ম বলেই তাড়ানো আরও শক্ত। যেমন মকরধ্বজ যতই সূক্ষ্ম করে চূর্ণ কর সেই অনুমকরধ্বজ ততই তীব্রতর।

কিন্তু কৃপা হবে কি করে, তিনি যদি দয়া করে আকর্ষণ করেন তবেই তো আমরা তাঁর দিকে আকৃষ্ট হব। তাঁর দয়া তো নিত্য বিচ্ছুরিত, স্থানা স্থান কালাকাল নেই। তবে সেই দয়ার শুদ্ধচিত্ত নইলে প্রতিফলন হবে কি করে? শুদ্ধচিত্ত তপস্যা একটু না করলেই বা হয় কেমন করে। শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে আছে তিনি "অবাঙ্‌মনসাগোচরম্" তিনি এই দেহমন বাক্যের অতীত বটে কিন্তু তিনি শুদ্ধাবুদ্ধি, শুদ্ধামন শুদ্ধাজ্ঞানের গোচর। শুদ্ধ দেহ শুদ্ধ মনের আধার। তাঁকে জানতে

পারার জন্য তাঁরই স্মৃতি অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার মত হৃদয়ে বহন করে নিয়ে যেতে পারার জন্য যতটুকু সাধনের দরকার, সেই-টুকুতেই আমাদের প্রয়োজন। তিনিই লক্ষ্য, আর সব উপলক্ষ্য মাত্র। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, "শোর গরু খেয়েও যদি কেউ ঈশ্বরেতে মন ফেলে রাখে তবে বলি সেই ধন্য। আর হবিষ্যান্ন খেয়ে যদি কেউ বিষয় চিন্তা করে ধিক তাকে।" কি জানি আমাদের ছটাকে বুদ্ধি দিয়ে তাঁর কার্য্যকারণ বুঝতে চাওয়া। আমাদের কেবল একমাত্র কর্ত্তব্য তাঁর দিকে চেয়ে দাসের মত অপেক্ষা করা তিনি যখন যা ভালো বুঝবেন করবেন। ললিত বিস্তরের একটি গাথা প্রায়ই মনে পড়ে ঃ

"নাভিনন্দেত মরণং নাভিনন্দেত জীবিতম্
কালমেব প্রতীক্ষেত নির্দ্দেশং ভৃত্যকোযথা।"

কীর্ত্তন শেষ হয়ে গেছে। দিনের বেলায় আমাদের বাড়ী ফিরবার তাড়া থাকে না, ট্রাম বাস তো বন্ধ হয় না। মহারাজের পিছনে দাঁড়িয়ে তাঁকে বাতাস করি, কিম্বা যে দিন বিজলী পাখা চলে হাওয়ার দরকার থাকে না, সেদিন তাঁর পাশে রাখা বিরাট মালার স্তূপ থেকে বড় মালাগুলি ছিঁড়ে দুভাগ করে গেঁথে দিই। কত শত শত ছেলেমেয়ে স্ত্রীপুরুষ অগণ্য ভক্তকে প্রণামের পরে তিনি মালা দে'ন। এসব অতি তুচ্ছ কাজ, এ কেবল একটা ছল খোঁজা, কোন উপলক্ষ্যে যতক্ষণ তাঁর সান্নিধ্য পাওয়া যায়। কীর্ত্তন শেষ হওয়ার পরেও প্রায়

দু'ঘণ্টা আড়াই ঘণ্টাকাল কেটে যায় সমবেত ভক্ত শিষ্য দর্শন প্রার্থীদের প্রণাম শেষ হতে। ততক্ষণ তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে কেবল মনে হয়, ভাগবতে যে আছে কৃষ্ণের দেহ দেহী ভেদ নেই, তাঁর দেহ চিন্ময়, তাঁর প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চিন্ময়, প্রতি অঙ্গ সচ্চিদানন্দময়, পূর্ণ, নিত্য, অপরূপ সুগন্ধশালী সে কথা তো কেবল শাস্ত্রে পড়া কথা নয়, আমরা নিত্য তা দর্শন করছি। নিত্য তা চিত্ত মন প্রাণ ভরে অনুভব করছি। রাত্রিতে কিন্তু সৌভাগ্য এত হয় না। কীর্ত্তন শেষ হতে প্রায় এগারোটা বেজে যায়। ইচ্ছা অনমনীয় হ'লেও, জোর করে মনকে মানিয়ে দূরে থেকে প্রণাম করে চলেই আসতে হয়। ট্রাম বাস আর পাওয়া যাবে না। আট মাইল রাস্তা সেই বালীগঞ্জ পেরিয়ে কোথায় টালিগঞ্জ। সেদিন কিন্তু রাত্রির কথা ভুলে গেছি, শোভনেন্দু অনেকবার ডেকেও সুবিধা করতে না পেরে শেষে ভলান্টিয়ারকে দিয়ে ডেকে পাঠালো। আজ বুঝি তোমার বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পেয়েছে! আমারও খুব ভয় হয়েছিল। রাত্রি সাড়ে এগারোটার কাছে। আমার ভাই বললে, খুব করে রাজার দোহাই দাও নইলে আট টাকা ট্যাক্সি ভাড়া লাগবে। দেখি আবার একটি ট্যাক্সি ডাকি! যেমন তোমার কাণ্ড!

আমি বললাম, না ভাই রাজার দোহাই দিতে পারব না, এমনই ছোট বড় সকল বিষয়ে যদি কেবলই রাজার দোহাই দিই, তাহলে যে দোহাই দিতেই জীবন কাটবে, রাজাকে পাব

কী করে। কোন একটা condition সফল হ'লে বা পূর্ণ হলে বা কোন একটা ব্যাপার ঠিক ঠিক মিলে গেলে বা একটা জিনিষ পেলেই তাঁকে মানব এ হতে পারে না। তিনি তো সব প্রয়োজনের অতীত। এতক্ষণ একমনে তাঁকেই দর্শন করছিলাম, এতে যদি কোন অসুবিধা সহ্য করতে হয় হবে। শোভনেন্দু বললে, যদি রাজার দোহাই না দেবে, তাহলে তুমি টাকা দিও, আর খুব জোরে পা চালিয়ে হাঁট দিকি, ট্রাম ষ্টপেজের কাছ পর্য্যন্ত। কিন্তু যদি ট্রাম না পাই তাহলে মনটা খারাপ হবে কিনা বল দেখি সত্যি। সত্যি কথা বলবে, লুকোবে না কিন্তু। আমি হেসে বললাম, শ্রীরামকৃষ্ণের সেই গল্পটা জানিস না? একদিন দক্ষিণেশ্বরে অনেক ভক্ত একত্র হয়েছেন, খুব আনন্দের স্রোত গল্প হাসি গান। অনেক রাত, বাড়ী যাবার সময় একজন ভক্তের জুতো হারিয়েছে, খুঁজতে খুঁজতে শেষে পাওয়া গেল। শ্রীরামকৃষ্ণ হেসে বললেন, পাওয়া গেল তো? না পাওয়া গেলে এখানকার কথা আর মনে থাকত না। একটু আগে এত যে আনন্দ, মনে হোত সব ফাঁকি! যাক্ পাওয়া গেল। আমাদের ট্রাম ষ্টপের কাছে এসে দাঁড়াতেই ট্রাম পাওয়া গেল, উঠে বসলাম। বললাম, আমাদের তো শুধু রাজা নয় রাজ রাজ মহারাজ। তাঁকে দোহাই দিতে হয় না। তিনি নীরবে থাকেন আর নীরবে সমস্ত দেখেন। ভেবে দেখ, বিডন্ ষ্ট্রীট থেকে রোজ রাত্রি এগারোটা সওয়া এগারোটার সময় বেরিয়েছি, এক মাইলের বেশী রাস্তা হেঁটে তবু কোনদিন

গাড়ী না পাওয়া হয়নি বা যাবার কোন অসুবিধা হয়নি। আর যদি হোত তাতেই বা ক্ষতি কি? আগে লোকে দেবদর্শন, তীর্থদর্শন কত কষ্ট করে করতেন, মহাপ্রভুর সময়ে ভক্তেরা চারি মাসের পথ চিঁড়ে বেঁধে নিয়ে পায়ে হেঁটে কত কষ্টে বাংলা থেকে নীলাচলে যেতেন। আধুনিক যুগে সবই সহজ, সবই অতি সুলভ, তাইতো আমরা সব পেয়েও কিছুই পাচ্ছি না। মহারাজ যদি বালীগঞ্জ, আলীপুর, ভবানীপুর এসব জায়গায় না থেকে বিন্ধ্যাচলে কিংবা কৈলাসে কিংবা হিমালয়ে থাকতেন, তাহলেই আমাদের উচিত শাস্তি হোত। যাঁর হিমালয়ে থাকবার কথা, তিনি লোয়ার সার্কুলার রোডে বসে রয়েচেন এটা কি পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য্য নয়? তবু একদিন একটু ট্যাক্সি ডাকবার উপক্রম হয়েছে বলে আমাকে আবার বকতে সুরু করেছিস্।

* * * *

আমাদের মহারাজকে আমরা কেবল কীর্ত্তনের ভিতর দিয়ে পাই। প্রায় সাড়ে দশটা এগারোটা থেকে তাঁর কীর্ত্তন আরম্ভ হয়, দেড়টা দু'টো পর্য্যন্ত হয়। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা থেকে আবার রাত্রি এগারোটা অবধি হয়। তিনি তো আমাদের সাধনার কথা কিছু বলেন না। কখনও কাছে ডেকে জিজ্ঞেসও করেন না, তুমি জপ কত করছ, ধ্যান কি রকম করছ, একাদশী কর কিনা? অমাবস্যা বা পূর্ণিমাতেই বা অন্নআহার কর কিনা?

তিনি কিছুই বলেন না। ভগবান যেমন কেবল দর্শন দে'ন, দর্শন এবং স্পর্শন মাত্রেই জীবের প্রেমলালসা তিনি জাগ্রত করে দিতে পারেন। তেমনই মহারাজ কেবল দর্শন দিলেন, বেণুগীতে ত্রিজগত আকর্ষণ করতেন, মহারাজ সংকীর্ত্তন এবং সঙ্গীতের বেণুদ্বারে জীবকে আকর্ষণ করলেন। একদিনের একটি গানের কথা মনে পড়ছে। মহারাজ কীর্ত্তন সভায় গাইলেন ঃ

"স্বপনে তোমায় পেয়েছি হে প্রভু
পেয়েছি গানের সুরে
তুমি নিশিদিন সকল কর্ম্মে
আছ মোর হিয়া জুড়ে···"

এটি রবীন্দ্রনাথের একটি গান মাত্র। গীতার ব্যাখ্যা নয়, শ্রুতিস্মৃতি বেদ-বেদান্ত পুরাণ ভাগবত কিছুই নয়। দক্ষিণ কলিকাতার কোন কোন প্রাসাদতুল্য বাড়ীতে আধুনিক সঙ্গীতের আনুষঙ্গিক আয়োজন, বেহালা, হার্ম্মোনিয়াম ঐ গানটির সঙ্গে বেজেছিল। আপাত দৃষ্টিতে বর্ণনা শুনে মনে হতে পারে এর মধ্যে এমন কী বস্তু আছে যা সহস্র নরনারীকে এক নিমেষের মধ্যে সেই অখিলরসামৃত মধুর মূর্ত্তি পরম কারুণিক শ্রীভগবানের সান্নিধ্য স্মরণ করিয়ে দেয়? কী যে আছে তাতো মহারাজকে দর্শন না করলে উপলব্ধি হয়না। মহারাজের এত রূপ যে মনে হয়, একমাত্র শ্রীমনমহাপ্রভু ছাড়া এতরূপ আর কখনও কোন নরদেহধারী নরলীলা কারী বিগ্রহের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়নি। চরিতামৃতে আছে ভাবের উদ্বেলতা

বা উল্লাসের সময় মহাপ্রভুর শ্রীমুখখানি দ্বাদশ বর্ষীয়া সুকুমার বালিকার মত শ্রীধারণ ক'রত। একটি পদে পাওয়া যায়ঃ

"মুখখানি পূর্ণিমার শশী কিবা মন্ত্র জপে।
বিম্ব-বিডম্বিত ঠোঁট কেন সদা কাঁপে॥"

মহারাজ যখন গৈরিক বসন অঙ্গে, মালায় পূর্ণিত বক্ষে, হাতে তুলে নিয়ে খঞ্জনী, সেই মৃদু মৃদু খঞ্জনীর আঘাতের সঙ্গে মুদিত ভাব নিমীলিত নয়নে গাইলেনঃ

"স্বপনে তোমায় পেয়েছি হে প্রভু
পেয়েছি গানের সুরে।"

তখন অতি মৃদু কণ্ঠস্বর তাঁর প্রথম গানের লাইনটি ধরবার সময় ভাবকম্পিত, মৃদু অতি মৃদু হয়ে বায়ুতরঙ্গে মিশিয়ে গেল। কি ছিল সব জড়িয়ে এর মধ্যে কি করেই বা জানাব, কিন্তু কেবলই মনে হ'তে লাগল যাঁর মাধুর্য্যরসামৃতের এক কণাও বর্ণনা করতে না পেরে বিল্বমঙ্গল ঠাকুরঃ

"মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো
মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিত মেত দেহো
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্...।

বলে অবশেষে ছেড়ে দিয়েছেন। সেই মধুরের প্রতি আমাদের লালসা একান্তই জাগ্রত করে দিয়েছেন তিনি। যুগে যুগে এই লোভ জাগ্রত করে দেওয়াই ধর্ম্মসাধনার চরম কথা। মহারাজকে এই কীর্ত্তনানন্দের মধ্যে, এই সঙ্গীতরস

নির্ঝরের মধ্যে দর্শন করলে, অনুভব করলে, আমাদের এই লালসা নিরন্তর বাড়তে থাকে। কি বলচেন তিনি, কি বক্তৃতা দেবেন, কি বিধি নিষেধ শোনাবেন, কিসেরই বা প্রমাণ প্রয়োগ করবেন, তিনিই যে সেই, একমাত্র মহারাজই একথাটি হৃদয়ের মাঝে গেঁথে দিতে পারেন। এমন অপ্রাকৃত সুরদুর্লভ পরিবেশ এমন অমরাবতী সদৃশ আবহাওয়া তিনি এই ধুলি ধূসর কলকাতামহানগরীতে সৃষ্টি করেন কি ইন্দ্রজালে তা কে জানত! অপরোক্ষ অনুভূতির এইখানেই শ্রেষ্ঠতা। ঐ আকাশ এই আমি, ঐ সেই ত্রিভুবন আকর্ষণ কারী প্রভু আর এই আমরা আর্ত্ত পিপাসিত শত শত নরনারী পরস্পরের মধ্যে তন্ময় হলে পরে প্রমাণ হয় নিষ্প্রয়োজন। কথা দিয়ে যা বলা যায়না, যা বাক্য মনের অতীত, মহারাজ নিজের চিণ্ময় অস্তিত্ব এবং উপস্থিতি আর তাঁর কণ্ঠের ভাবনিমজ্জিত সুরের দ্বারা চিত্তে তাই সঞ্চার করে দিচ্ছেন। বৈষ্ণব ধর্ম্মে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধার অষ্টকালীন লীলাস্মরণ সাধনার একটি বিশেষ অঙ্গ। আমাদের মহারাজের অষ্টকালীন লীলা কেবল নাম, কীর্ত্তন এবং সঙ্গীতে এসে বিশ্রামলাভ করেছে। কীর্ত্তনই তাঁর প্রাণ। শ্রীশ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন এবং সুর ও সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে নামের রসঘন স্বরূপের প্রচার, নাম-নামীর অভেদত্ব প্রকাশ এই তাঁর সর্ব্বোত্তম লীলা। যখন যেমন তখন তেমন এ হচ্ছে ভগবানের একটি প্রিয় পদ্ধতি। মহারাজ কীর্ত্তনের আসরে বৈষ্ণবপদাবলী, রবীন্দ্রনাথের গান, অতুল প্রসাদের গান কাজী নজরুলের, সাধক রামপ্রসাদের,

কমলাকান্তের নীলকণ্ঠের দ্বিজেন্দ্রলালের, রজনীকান্ত সেনের, মীরাবাঈয়ের, ব্রহ্মানন্দের কোন গানই বাদ দেন না। যখন যে ভাবটি ফুটিয়ে তুলতে হ'য়, মহাজন পদাবলী থেকে আরম্ভ করে তুলসীদাসের দোঁহা, ভজন, আধুনিক, কাব্যগীতি, রবীন্দ্র সঙ্গীত, শ্যামাসঙ্গীত সমস্ত থেকেই রস আহরণ করে সেই ভাবটি রসে রূপে উচ্ছল করে তোলেন। তারপরে তাঁর কীর্ত্তনের আসরের আর একটি বিশেষত্ব তিনি সমস্ত গানই ভাবপ্রধান করে সহজ সুরে গান করেন। দু'একবার শুনবার পরেই অধিকাংশ দর্শক তাঁর সঙ্গেই গাইতে পারেন, যাঁদের একটু সুর-জ্ঞান আছে বা সঙ্গীতে একটু দখল আছে তাঁরা সকলেই গান করেন। মহারাজ প্রথমে একলাইন গাইলেন, তারপরে সেই লাইনটি দোহার দিয়ে সবাই গাইলেন। এতে তাঁর সঙ্গে একটা সক্রিয়া সহযোগ স্থাপিত হয়ে অনেকের চিত্তশুদ্ধি হয়ে যায়। তারপরে কিছুক্ষণ গেয়ে তিনি থামলেন এবং আসনে নীরবে ব'সলেন। আসরে অপর অনেকে গান গেয়ে তাঁকে শোনাতে লাগলেন। তাঁদের গানের সঙ্গে মহারাজ খঞ্জনী বাজাতে লাগলেন। এতে তাঁকে দুই রূপে দেখে আমরা ধন্য হই। যখন তিনি নিজে গান করেন তখন সক্রিয় ঈশ্বর সৃষ্টির নানা কাজ, নানা সুর, নানা বিধানে ব্যস্ত। আবার কোন ভক্ত যখন ভাব-মোহিত হ'য়ে গেয়ে চলেছেন আর মহারাজ ভাবস্থ হয়ে মুদিত নেত্রে শুনছেন তাঁর শ্রীহস্তের খঞ্জনী সেই ভাবের অনুরূপে বেজে চলেছে, তখন তাঁর আর এক শোভা! পরমরসিক পুরুষ সমস্ত

কর্ম্ম প্রচেষ্টাকে স্তব্ধ করে, সাক্ষী, শান্তি, দ্রষ্টার মত বিরাজিত রয়েচেন। কখনও কখনও মহারাজকে এই সাক্ষীরূপেই আরও ভালো লাগে। বিশেষ করে, যখন সত্যই কোন ভালো গায়ক রসাভাস না করে, মহারাজ যে ভাবে ভাবিত বা ঠিক পূর্ব্বমুহূর্ত্তে যে ভাবের গান করেচেন সেই ব্যঞ্জনার ইঙ্গিতটুকু ধরতে পেরে ভক্তি দিয়ে গান করেন আর মহারাজ তন্ময় হয়ে তা শ্রবণ করেন তখন আর একটা বিশেষ সৌন্দর্য্য হয়। সমুদ্র যখন তরঙ্গায়িত হ'য় তখনও তার অপার শোভা আবার যখন সেই অনন্ত সুন্দরের স্মৃতিকে অন্তরে স্তম্ভন করে ধ্যানবদ্ধ হয়ে একে-বারে স্থির ধীর হয়ে যায়, তখনও সে অপরূপ। কোন্‌টা ফেলে কোন্‌টা রাখি এই আর কি! মহারাজের এই বকম নীরব একটি ছবি এই বারকার কীর্ত্তন-সভায় দেখে ধন্য হয়েছি। শ্রদ্ধাস্পদ সুবোধ দে, আগে মহারাজের সঙ্গে সঙ্গে বহুদিন কীর্ত্তন করেছেন, তিনি শুধু যে ভালো গান করেন তাই নয়, তিনি মহারাজের সঙ্গীতের ভাবসিদ্ধ। ঠিক যে ভাবের তরঙ্গ মহারাজ আগের মুহূর্ত্তে তাঁর গানের সুরে তরঙ্গায়িত করেছেন, সেই স্পন্দনকে ক্ষুন্ন না করে ব্যাহত না করে গান করতে পারা শুধু সঙ্গীতের শক্তি থাকলে হয় না, ভক্তিও চাই। তাঁর সঙ্গে মানসিক যোগ স্থাপন চাই।

সুবোধ এবার বড়দিনের বন্ধে হাইকোর্টের কাজে অবসর পেয়েছিলেন বোধ হয়। তাঁকে ছ'বেলাই কীর্ত্তনের আসরে দেখতাম আর তাঁর গানের সময় মহারাজের মাধুরী

আমরা প্রাণভরে উপভোগ ক'রতাম। সেদিন সুবোধ গাইছিলেন ঃ

"দাঁড়াও আমার আঁখির আগে
যেন তোমার দৃষ্টি হৃদয়ে লাগে
সমুখ আকাশে চরাচর লোকে এই অপরূপ
আকুল আলোকে দাঁড়াও হে
আমার পরাণ পলকে পলকে চোখে চোখে তব দরশ মাগে
এই যে ধরনী চেয়ে বসে আছে, ইহার মাধুরী বাড়াও হে
ধুলায় বিছানো শ্যাম অঞ্চলে দাঁড়াও হে নাথ, দাঁড়াও হে।
যাহা কিছু আছে সকলই ঝাঁপিয়া, ভুবন ছাপিয়া জীবন ব্যাপিয়া
দাঁড়াও হে।
দাঁড়াও যেখানে বিরহী এ হিয়া
তোমারি লাগিয়া একেলা জাগে।

এই গানটি গাইবার সময় মহারাজ খুব তন্ময় হয়ে শুনছিলেন। এই গানের রেশ আর স্মৃতি বহুদিন পর্য্যন্ত মনে মনে ধ্বনিত হ'য়েছিল। বিশেষ করে এই লাইনটি ঃ

"আমার পরাণ পলকে পলকে চোখে চোখে
তব দরশ মাগে।"

আমরা তাঁর দর্শন ভিখারী, দর্শন তিনি বার বার দিচ্ছেন। তাঁর শ্রান্তি নেই, ক্লান্তি নেই, বাচবিচার নেই, যে ডাকছে, যেখানে ডাকছে সেখানে যেয়ে তাদের দর্শন দিচ্ছেন। জীবের কল্যাঁণই তাঁর একমাত্র কাম্য। কল্যাণ করবার কি আর সময় অসময় থাকে। কিন্তু আমরা এই দর্শনের স্মৃতিকে কেন চিরায়মান করে রাখতে পারছি না। "সেই ক্ষণকালটুকু হোক চিরকাল"—এটি তো আমরা জীবনে সফল করে তুলতে পারছিনা। আগুণের কাছে

গেলে লোহা উত্তপ্ত হয়ে লাল হবে, যতক্ষণ অগ্নির কাছে থাকবে ততক্ষণ কিছুপরিমাণে অগ্নির সমধর্ম্মী হবে। এটি আগুণেরই একটি গুণ। তেমনই আমরা যতক্ষণ মহারাজেব কাছে থাকি, কোথায় কোন রাজ্যে চলে যায় আমাদের মন। আহারবিহার দেহধর্ম্ম দেহচেষ্টা এসবও কমে যায়। ভগবানেব সঙ্গ সহ্য করাই তপস্যা। তপস্যা আব জোর করে করতে হয় না, আপনা আপনি তপস্যা এসে যায়। শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবতে আছে, শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু যখন পবমানন্দে নাম সঙ্কীর্ত্তন প্রচার করে বেড়াচ্ছিলেন তখন লোকে আহার নিদ্রা ভুলেছিল, এমন কি তিন মাস পর্য্যন্ত কারও আব না'বাব, খাবার ঘুমোবার কথা মনেও আসেনি—

"নিত্যানন্দ স্বরূপের প্রেমদৃষ্টিপাতে।
সভার হইল আত্মবিস্মৃতি দেহেতে॥ .....
....এই মত পানিহাটি গ্রামে তিনমাস।
করে নিত্যানন্দ প্রভু ভক্তির বিলাস॥
তিনমাস কারো বাহ্য নাহিক শরীরে
দেহধর্ম্ম তিলার্দ্ধেকো কাহারও না স্ফুরে॥"

কিন্তু আবার মহারাজের পুণ্যসঙ্গ ছাড়া হয়ে সংসারে যখন ফিরে আসি তখন লোহা আব সোণার মত লাল থাকেনা, ক্রমশঃ লোহা আবার লোহাই হ'য়ে যায়। তিনি তো স্বয়ংপ্রকাশ, সর্ব্বদাই নিজেকে প্রকাশিত করে র'য়েচেন, সাধনভজন করে আমরা আর তাঁকে কি প্রকাশিত করব। আমরা কেবল

নিজের নিজের দেহমনচিত্ত, শুদ্ধ করে মার্জ্জনা করে রাখতে পারলে তাঁর এই প্রকাশকে ধরে রাখতে পারি। মনে হয় মহারাজ তাঁর এই দৃষ্টিস্মৃতি, অনুভবস্মৃতি, মাধুর্য্যস্মৃতি, আনন্দ-স্মৃতি এক কথায় শুদ্ধচিত্তের অনুভব বেদ্য তাঁর অপরূপ রূপটি আমাদের হৃদয়পটে ধরে রাখবার একটি সঙ্কেত বলে দিয়েছেন। তিনি নিজেকে আমাদের কাছে দান করেছেন আর সেই সঙ্গে নাম-নামী অভেদ তাঁর রসঘনচিন্ময় নামও ইষ্টমন্ত্ররূপে আমাদের দান করেছেন। ঐ সূত্রটি তা এখন যতই ক্ষীণ মনে হোক যদি প্রাণপণে ধরে থাকতে পারি হয়তো একদিন আমাদের এই আকুল বাসনা ঃ

"আমাব পবাণ পলকে পলকে, চোখে চোখে তব দরশ মাগে।"——

পূর্ণ হতে পারে। নইলে এমনই মহারাজের সঙ্গ লোভে যতই ছুটোছুটি করি এক সময় তো ক্ষান্তি দিতে হবেই। যখন তাঁর জন্যে খুব মন কেমন করে তখন এই মনে করেই সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করি। আর তাঁরই শ্রীচরণে ব্যাকুল প্রার্থনা নিবেদন করি এই নামের বরণ মালায় জড়িত হ'য়ে তাঁর সঙ্গে আমাদের যোগ ক্রমেই নিবিড়তম গভীরতম হ'য়ে উঠুক। শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকেও একবার একজন ভক্ত প্রশ্ন করেছিলেন, কি করে কি উপায়ে মানুষের দেহমন চিত্ত শুদ্ধ হয়? তাতে তিনি বলেছিলেন ঃ "কেবলমাত্র অবিশ্রান্ত নাম জপের দ্বারাই হয়। শ্বাসে প্রশ্বাসে অহরহ তাঁর নাম করা অভ্যাস করতে থাকলে ক্রমে দেহের প্রতি অনু পরমানুতে প্রতি শিরা

স্নায়ু অস্থি মজ্জা সবেতে তাঁর নাম গাঁথা হ'য়ে যাবে। তখন আর ভুলতে পারবে না। আপনা আপনি তাঁর নাম অবিশ্রান্ত ধ্বনিত হতে থাকবে।" কুম্ভমেলার সময় যমুনার গর্ভে গোস্বামী প্রভু একদিন একটি বৈষ্ণব সাধকের অস্থি কুড়িয়ে পান। ঐ অস্থির প্রতি রোমে রোমে "হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ" লেখা ছিল। আর একদিন একজন বৈষ্ণব কীর্ত্তন শ্রবণ করতে করতে সমাধিস্থ হ'য়ে যান, গোস্বামীপ্রভু তাঁর শিষ্যদের বলেন: "তোমরা তাঁরহৃদয়ের কাছে কাণ পেতে শোন একটি শব্দ অবিশ্রান্ত শুনতে পাবে: "সুখময় বৃন্দাবন," "সুখময় বৃন্দাবন।" ঐটি শুনতে শুনতে তিনি সমাধিস্থ হয়ে পড়েন। ঐ শব্দটি এখনও অবিশ্রান্ত তাঁর মধ্যে তরঙ্গায়িত হচ্ছে। কিছুতেই থামছে না।" মহারাজ কীর্ত্তনের শেষদিকে যখন দাঁড়িয়ে উঠে একাই গান করেন। তখন এই গানটি প্রায়ই করেন:

"যব প্রাণ তনসে নিকলে
যব প্রাণ ঘটসে নিকলে
বৃন্দাবনকি থল হো
বিষ্ণুচরণ কি জল হো
তেরে ধ্যান মেরা ঘটহো ....

এইটি হওয়াই শক্ত। বৃন্দাবনের রজঃ গঙ্গাজল, তুলসী সব কিছুই পাওয়া যেতে পারে হয়তো সুকৃতি থাকলে কিন্তু তোমার ধ্যান কি করে তখন আসবে যখন সমস্ত দেহমনের উপর একটা বিপর্য্যয় কাণ্ড ঘটে যাচ্ছে. বত্রিশ নাড়ির বন্ধন এক

এক করে ছিন্ন হচ্ছে তখন সেই ধ্যান করা কি করে সম্ভব যদি না সারাজীবন একান্ত অভ্যাসের ফলে তা এমন স্বাভাবিক এমন অন্তর্নিহিত হয়ে দাঁড়ায় যার বলে সকল যন্ত্রণা উপেক্ষা করেও তা অবাধে আপন কাজ করে যাবে। যেমন দারুণতম যন্ত্রণা বা মানসিক বিপর্য্যয়ের মধ্যেও আমরা তো নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নিতে ভুলে যাইনা। তারা সব কিছুর উপরে নিজের কাজ করে যায়ই।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব তাই কথামৃতে বলেছেন "পাখীকে যতই রাধাকৃষ্ণ বুলি আওড়াতে শেখাও, বেড়ালে এসে যখন গলায় ধরবে তখন ট্যাঁ ট্যাঁ করবে। তখন আর বুলির শেখানো কথা মনে থাকবেনা। এইটি যাতে না হয় সেই চেষ্টা কর।"

* * * *

আজ ৩১শে ডিসেম্বর, ইংরাজী হিসাবে বছরের শেষ দিন। আজ দিনের বেলায় মহারাজ এই গানটি গাইলেন ঃ

"বরষ গেল বৃথায় গেল কিছুই করিনি হায়,
আপন শূণ্যতা লয়ে জীবন বহিয়া যায়......।"

রাত্রিতেও কীর্ত্তনের আসর খুব চমৎকার হ'য়েছিল। অনেক রাত হয়ে গেল কীর্ত্তন শেষ হ'তে। তবে সেদিন বছরের শেষদিন বলে কলিকাতা মহানগরী জনাকীর্ণ, আলোক-মালায় সজ্জিত। তখনও পুরোদমে রাস্তায় যানবাহন চলছে। ইংরেজরা চলে গেছে, আর ততটা জাঁক জমক নেই, তবু আমরা প্রায় রাত্রি সাড়ে এগারোটায় যখন বীডন ষ্ট্রীট থেকে বেরিয়ে

ট্রামে টালিগঞ্জ যাব বলে উঠলাম তখন দেখি ফিরপোতে, গ্র্যাণ্ড-হোটেলে খুব গানবাজনা, ফুল, সারি সারি মোটর। সায়েব, মেম এবং এ্যংলোইণ্ডিয়ানরা কখন রাত্রি বারোটা বাজবে কখন ফোর্টউইলিয়ম থেকে নববর্ষের তোপধ্বনি হ'ব তারাও প্রার্থনার জন্যে গীর্জ্জায় যাবে এই সব প্রতীক্ষায় দলে দলে রাস্তায় সকলে সাজসজ্জা করে পায়চারি করছে। রাস্তায় যেতে যেতেই আমরা নববর্ষ পেয়ে গেলাম। বারোটা বাজল, জেটি থেকে একসঙ্গে সব জাহাজগুলো বাঁশী বাজাতে লাগল। সবজড়িয়ে বেশ একটা উন্মাদনার দৃশ্য। কিন্তু মহারাজ একদিক দিয়ে জীবনটা বড় বিরস করে দিয়েছেন। একমাত্র তাঁর কথা আর তাঁকে দিয়ে পরিপূর্ণ সেই সব দৃশ্যের কথা ছাড়া আর কিছুই মনকে আনন্দ দিতে পারে না। রাস্তার দুপাশের এই সব বিচিত্র দৃশ্য এবং ধ্বনি ছাপিয়ে কিছুক্ষণ আগেকার ছবিটি মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে ঃ মহারাজ কীর্ত্তনের শেষে দাঁড়িয়ে একবার বামে একবার দক্ষিণে হেলে গাইছেন এবং তাঁর শ্রীচরণ দু'খানিও সেই ছন্দে আবর্ত্তিত হয়ে তাল দিচ্ছে। তাঁর শ্রীহস্তে খঞ্জনীর মৃদু মধুর ঝঙ্কার। মালায় পূর্ণিত বক্ষ। গৈরিক বসন ও উত্তরীয় পুষ্প স্তবকে ও মাল্যে আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। তিনি মুদিত নেত্রে গাইছেন ঃ

"সুন্দর দেবতা বিশ্ব বীণাতে বাজে তব নাম
লহ প্রাণের প্রণাম।
প্রিয় এলে কি অন্তর মন্দির মাঝে
বন্ধুর পথে বন্ধুর সাজে
গৈরিক বসন অঙ্গে বিরাজে নয়নাভিরাম
লহ প্রাণের প্রণাম।"

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে একটি পদ আছে ঃ

"স্মেরাং ভঙ্গীত্রয় পরিচিতাং সাচি বিস্তীর্ণ দৃষ্টিং
বংশীন্যস্তাধর কিশলয়ামুজ্জ্বলাং চন্দ্রকেণ
গোবিন্দাখ্যাং হরিতনুমিতঃ কেশিতীর্থোপ কণ্ঠে
মা প্রেক্ষিষ্ঠাস্তব যদি সখে বন্ধু সঙ্গেঽস্তিরঙ্গঃ।"

হে সখা! বন্ধু বান্ধবের সঙ্গ হাস্যপরিহাস ইত্যাদি আনন্দরঙ্গে দিন কাটাতে চাও তবে বৃন্দাবনের সেই গোবিন্দ, যিনি নবপত্রের ন্যায় কোমল রক্তবর্ণ-অধরে বাঁশী ধারণ করে ঈষদ্ধাস্যযুক্ত ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম বাঁকা নয়নে বিরাজিত তাঁকে দর্শন কোরো না। তবু কি মহারাজের এই রূপ দেখে আমরা ভুলেছি, তাঁর রূপগুণের যদিবা কথঞ্চিৎ ঠাহর করতে পারা যায়, তাঁর দয়ার কেউ অবধি করতে পারে না। দিনে দিনে পলে পলে তিলে তিলে তাঁর এই অদ্ভুত দয়া অদ্ভুত আত্মোৎসর্গ দেখে আমরা স্তম্ভিত হয়ে গেছি। তিনি নিজের বলতে কিছু আর রাখেননি। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত্ত কেবল লোককল্যাণের জন্য তিলে তিলে নিঃশেষে দান করে দিয়েছেন। চার পাঁচ ঘণ্টা একাসনে বসে কীর্ত্তনের পর আবার যখন প্রায় দেড় ঘণ্টা দু'ঘণ্টা ধরে সমবেত প্রত্যেকটি নরনারী তাঁর পাদস্পর্শ করে তাঁকে প্রণাম করে আর প্রসন্ন স্মিত হাস্যে তিনি নিজের হাতে প্রত্যেকের করে প্রসাদ ও গলে ফুলমালা তুলে দেন, তখন মনে হয় তাঁহার আহার বিহার নিদ্রা বিশ্রাম কিছুই নেই। সবই

তিনি জলাঞ্জলি দিয়েছেন বিশ্বমানবের কল্যাণ উদ্দেশ্যে। রবীন্দ্রনাথ যে বলে গেছেন ঃ

"আমি রূপে তোমায় ভোলাবনা
ভালো বাসায় ভোলাব
আমি হাত দিয়ে দ্বার খুলব না না গো
গান গেয়ে দ্বার খোলাব।"

মহারাজ তার পূর্ণ প্রকাশ। সঙ্গীতকে তিনি তাঁর প্রচারের প্রধান যন্ত্র এবং প্রধান মন্ত্র করেছেন। ঠিক কীর্ত্তন বা মহাজন-পদাবলী তদুপযোগী গৌরচন্দ্রিকা সহ যে চিরাচরিত কীর্ত্তনের পদ্ধতি আছে, মহারাজের সঙ্গীত বা কীর্ত্তন একেবারেই তার সঙ্গে মেলেনা। তিনি এমন করে সমস্ত জিনিষটির রূপ দিয়েছেন যে, এই আধুনিক জগতের বিচিত্র কর্ম্মজালে জড়িত জটিল জীবনযাত্রার পথিক সাধারণ অগণিত নরনারীর চিত্তে সহজেই মানব জীবনের চরম এবং পরম কাম্যটি কি? বা সেইটি পাবার সরল পথ কি? অতি অনায়াসে আনন্দের সঙ্গে গেঁথে যায়। হে প্রভু! হে পরম প্রিয়! তুমি এর আগে আরেক বার যখন কীর্ত্তন বিগ্রহ রূপে এসেছিলে তখন মানুষের মনন শক্তি অনেক বেশি ছিল তখন তার ভক্তি অনেক অধিক ছিল। তখন তুমি শ্রীলসনাতনকে শ্রীরূপকে গভীর অনন্ত অগাধ রস সমুদ্র নিভৃতে নির্জ্জনে বসে শিক্ষা দিয়েছিলে। তখন তোমার এমন ভক্ত ছিলেন, যিনি একমাত্র পুত্রের মৃত্যু সংবাদেও ভক্তরাজ শ্রীবাস রূপে হাত জোড় করে পুরস্ত্রীদের

বলেছিলেন : "আমার আঙ্গিনায় স্বয়ং প্রভু আনন্দ ভরে প্রেমনৃত্য করছেন তোমাদের শোকাকুল ক্রন্দনে যদি তাঁর নৃত্য বা আনন্দ ভঙ্গ হয় তবে আমি এখনই গঙ্গায় প্রবেশ করে প্রাণত্যাগ করব।" সে সমাজ সে ভক্তি সে মনন শক্তি এখন আর কিছুই নেই। এখন কেবল অন্নহীন বস্ত্রহীন দীন সমাজের অতি জটীল জীবনযাত্রার নিষ্পেষণে যে সব নরনারী আছে তাদের উদ্ধারের জন্যে তোমারই মত দিক চিহ্নহীন অকূল করুণা পারাবার প্রয়োজন। মহারাজ তা জানেন, তাই তাঁর দয়ার অন্ত নেই। তিনি গান করেন গীতা, ভাগবত, বৈষ্ণব-শাস্ত্র সমস্ত মন্থন করে সহজ ভাষায় সাধারণ নরনারীর বোধগম্য করে। তিনি কীর্ত্তনের মাঝে মাঝে একা এইগুলি যখন সুরের মধ্য দিয়ে বলতে থাকেন তখন তাঁর হাতের করতালও নীরব হ'য়ে যায়। শুধু ভাবমুদিত নেত্রে মধুর কণ্ঠস্বরে তিনি বলে যাচ্ছেন :

> "নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে ; যোগিনাম হৃদয়ে ন চ।
> মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ ॥"

সঙ্গে সঙ্গে বাংলা করে বুঝিয়ে দে'ন——

> "বৈকুণ্ঠে বা যোগীহৃদে নাহি মোর স্থান
> সেথা আমি নিত্য থাকি যেথা হরিনাম।"
> "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ
> অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যোঃ মোক্ষয়িষ্যামি, মা শুচঃ।"

"সর্ব্বধর্ম্ম ওরে নর কর পরিহার
শ্রীকৃষ্ণ চরণে এস, নাম কর সার।
জন্ম মৃত্যু দুঃখ জরা হবে নিবারণ
তোমার সকল পাপ হইবে মোচন।"
"অন্তকালে চ মামেব স্মরণমুক্ত্বা কলেবরম্
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্।"
"অন্তিমে অন্তরে করি আমার স্মরণ
আমার পবিত্র নাম করি উচ্চারণ
যেই জন ত্যজে তনু আমারে স্মরিয়া
পরমা সে গতি পায় মুক্ত তার হিয়া।"
"ন ধনং ন জনং সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি!"
"নাহি চাই ধন জন প্রিয়তা সম্মান
অন্য কোন বাঞ্ছা চিতে নাহি ভগবান!
জন্ম জন্ম ওহে নাথ এই কৃপা পাই
তোমার পাবন নামে আপনা হারাই।"

এই শ্লোকগুলি আমরা ধর্ম্মগ্রন্থে হয়তো অনেকবার পড়েছি, কিন্তু এখন যেভাবে এরা আমাদের হৃদয়পাষাণফলকে লেখা হ'য়ে গেল তা একমাত্র মহারাজ ছাড়া আর কেউ লিখে দিতে পারতেন না। তারপর হয়তো তিনি শ্রীশ্রীনরোত্তম দাসের

প্রার্থনা, বৈষ্ণবভাগবতগণের নানা রচনা সম্ভার আহরণ করে সুরে লয়ে তালে আবার গাইলেন :

"হরি হরয়ে নম কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ ॥
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন
গিরিধারী গোপীনাথ মদনমোহন।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত সীতা
হরিগুরু বৈষ্ণব ভাগবত গীতা।
জয় জয় শ্যামানন্দ জয় সচ্চিদানন্দ
নিধুবনে কৃষ্ণলীলা পরম আনন্দ।
এই ছয় গোসাই যবে ব্রজে কৈল বাস
ব্রজে নিত্য কৃষ্ণলীলা হইল প্রকাশ······।"

এ যেমন গাইলেন, বৈষ্ণব শাস্ত্রের সার, বা গীতা শ্রীমদ্ ভাগবতের শ্লোকগুলি সহজ বাংলায় সকলের বোধগম্য করে, সুরের ইন্দ্রজালে তাদের মধুর করে তুললেন; তেমনই এর পরেই আবার যখন গাইছেন :

"তোমারি ঝরণাতলার নির্জনে
মাটির এই কলস আমার ছাপিয়ে গেল কোন্ ক্ষণে ॥
······দিনে মোর যা প্রয়োজন বেড়াই তারি খোঁজ করে,
মেটে বা নাই মেটে তা ভাবব না আর তার তরে
সারাদিন অনেক ঘুরে দিনের শেষে
নেব আজ অসীম ধারার তীরে এসে
প্রয়োজন ছাপিয়ে যা দাও সেই ধনে······
তোমারি ঝরণা তলার নির্জনে—"

তখন স্পষ্টই বোধ হয় আধ্যাত্মিক রাজ্যে কোন গণ্ডী কোন সম্প্রদায় কোন ভেদ নেই। এ রাজ্যের যা সারকথা তা শ্রীশ্রীনরোত্তমদাস ঠাকুরের প্রার্থনা থেকে সুরু করে, গীতা, চণ্ডী, ভাগবত, অতুলপ্রসাদ, রজনী সেন, রবীন্দ্রনাথের আধুনিকতম গান দিয়েও বোঝান যায়। মহারাজ যখন রবীন্দ্রনাথের গানের এইখানটি গাইছিলেন :

"নেব আজ অসীম ধারার তীরে এসে
প্রয়োজন ছাপিয়ে যা দাও সেই ধনে
তোমারি ঝরণাতলার নির্জ্জনে......"

তখন সঙ্গীত যেন তাঁর মধ্যে শরীরী হয়ে সেই একই চিরন্তন সত্য ঘোষণা করছিল : সকল প্রয়োজনের অতীত সকল কামনা বাসনার অতীতঅহৈতুকী প্রেম। সকল শাস্ত্রের সকল বাণীর চরম পরিসমাপ্তি যেথায়। মহারাজ এই সঙ্গীতকেই তাঁর শ্রেষ্ঠপ্রচারের যন্ত্ররূপে গ্রহণ করেছেন। সাধারণতঃ তিনি দু'বেলা এই কীর্ত্তন সভায় তাঁর দর্শন এবং তাঁর গানের মধ্য দিয়ে তাঁর যা বলবার আছে ব'লেন,, তাঁর যা দেবার আছে দান করেন। এবার এই বড়দিনের মধ্যেই বীডন ষ্ট্রীটের কীর্ত্তন সভায় একদিন তিনি গেয়েছিলেন :

"যারা কথা দিয়ে তোমার কথা বলে
তারা কথার বেড়া গাঁথে কেবল দলের পরে দলে
একের কথা আরে
বুঝতে নাহি পারে,
বোঝায় যত, কথার বোঝা ততই বেড়ে চলে।

যারা কথা ছেড়ে বাজায় শুধু সুর,
তাদের সবার সুরে সবাই মেলে নিকট হতে দূর।
কেউ বোঝে কি নাই বোঝে
তারা থাকে না তার খোঁজে,
বেদন তাদের ঠেকে গিয়ে তোমার চরণ তলে॥

মহারাজ এই চিরন্তন সুরের মধ্য দিয়েই তাঁর যা দানের জিনিষ অকাতরে বিতরণ করে যাচ্ছেন সেইজন্যে দেখি তাঁর কাছে এই যে সহস্র সহস্র নরনারী আসছেন, এঁদের মধ্যে কোন সাম্প্রদায়িকতা, কোন একটা বিশেষ দল বা গণ্ডী নেই। কীর্ত্তনের সভায় অনেক দূর দূরান্তর থেকে যে সব মায়েরা সংসারের শত কাজ সেরে ব্যাকুল হ'য়ে আসতেন তাঁদের অনেকের সঙ্গেই পরিচয় হয়েছিল। সকলেই যে মহারাজের শিষ্যা তা ন'ন। একজনের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তজননী শ্রীশ্রীসারদা মায়ের শ্রীচরণাশ্রিত। তাঁর মেয়েরা আসতেন, তাঁরা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ প্রণেতা সারদানন্দ মহারাজের আশ্রিতা। দেওঘরে যজ্ঞের সময় এক সঙ্গে একটি ঘরে আমরা অনেকেই থাকতাম। মহারাজের গল্পই হোত। তখন আমার বোন বেলা আমাকে খুব উৎসুক হ'য়ে প্রশ্ন করেছিল: "আচ্ছা ভাই, মহারাজের কাছে দীক্ষা নিলে কি তিনি আমাকে আরও ভালোবাসেন?" খুব জটিল প্রশ্ন।

আমি বললাম: "আমার ব্যক্তিগত মত যদি জিজ্ঞেস কর

ভাই, আমার মহারাজকে শুধু গুরু বলে মনে হয় না। তিনি গুরুর চেয়ে অনেক বেশী, তিনি স্বয়ং ভগবান।" ঐ যে গুরুস্তবে আছে "তৎ পদং দর্শিতং যেন, তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।" কিন্তু কার পদ দেখাবেন? আর কার দ্বারাই বা প্রদর্শিত হচ্ছে? কর্ত্তা কর্ম্ম করণ সমস্তই যে মহারাজের শ্রীচরণে একীভূত হ'য়ে মিশেছে। তিনি নিজেই নিজেকে দেখাচ্ছেন। তিনি যদি নিজের মুখের উপর নিজে আলো না ফেলবেন তবে জগতের সমস্ত আলোও তাঁকে দেখাতে পারে না। যজ্ঞের আগে ভাগলপুর থেকে তাঁর সঙ্গে আসছিলাম। রামপুর হাটে একটি শোকার্ত্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণ হঠাৎ মহারাজের গাড়ীতে উঠে বসলেন। তাঁর একমাত্র পুত্রের মৃত্যু হওয়ায় তিনি পাগলের মত ঘুরে বেড়াচ্ছেন। প্ল্যানচেট্ করে মৃত ছেলেকে ডেকে এ'নে যদি শান্তি পান সে চেষ্টাও করেছেন কিন্তু শান্তি পাননি। মহারাজ তাঁর কথা স্থির হ'য়ে অনেকক্ষণ শুনে তারপর তাঁকে বোঝাতে লাগলেন। ট্রেণের বিরামহীন গতি, ফাল্গুন শেষের দুপুরবেলার খর রৌদ্রের তপ্ত বাতাসের মধ্য দিয়ে তাঁর মৃদু কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হ'তে লাগল। একটি কথা আজও আমার কাণে বাজছে: মহারাজ বললেন, "ভগবানের কাছে প্রত্যেকটি নরনারী সদ্যোজাত শিশুর মত নির্ম্মল, সুন্দর।" ঐ কথাটির মধ্যেই মহারাজ আমাদের কতটা ভালোবাসেন তার নিশানা রয়েছে। তাঁর কাছে, অর্থাৎ ভগবানের কাছে প্রতি নরনারী সদ্যোজাত শিশুর মত সুন্দর। তাঁর কাছে তুমি বেলা-মা, আমি আশা-মা,

তুমি দীক্ষা নাওনি, আমি নিয়েছি এসবের কোন ভেদ নেই। তবে আমাদের দিক থেকে মহারাজকে গুরু করলে আমাদের পক্ষে শরণাগতির আরও সুবিধা হয়। চিরদিন ধরে সকল শাস্ত্রে, গুরু পরম্পরারূপে যে শক্তির মহিমা বর্ণন তার আশ্বাস তার আশ্রয় আমরা পাই। সেটা আমাদের মত শক্তিহীন ক্ষুদ্র জীবের পরম আশ্বাস বা আশ্রয়ের জন্যে। মহারাজের কোনই প্রয়োজন নেই তার।"

আমার ভাই শোভনেন্দুরও তাই মত। সে বললে, "আমারও ঠিক তাই মনে হয়। মহারাজের কাছে কোন ভেদ নেই। তিনি সর্ব্বদা ব্রহ্মবিহার করছেন।" ভাগলপুরের উকীল নীরজবাবুর স্ত্রী বললেন, "কি তোমরা বড় বড় কথা বল, মোটের উপর ঠিক করে বল দেখি মহারাজ আমাকে ভালোবাসেন কি না? কিন্তু যা ভীড়! এমনিতেই আমার তো মাথা ঘুরচে। একটি লোককে দেখতে, তাঁর সঙ্গ পেতে দেশ দেশান্তর থেকে এই হাজার হাজার লোক শত অসুবিধা স্বীকার করে ছুটে এসেছে। আমি তো দেখে অবাক মানছি।" আমি বললাম: "ব্রহ্মবিহার মানে খুব সোজা। বুদ্ধদেব ব্রহ্মবিহার বলতে কি বোঝেন এককথায় বলেছেন: মা তাঁর একমাত্র ছেলেকে যেমন ভালোবাসেন পৃথিবীর সকলের উপর যখন সেই ভালোবাসা জন্মায় তা-ই ব্রহ্মবিহার।"

আমি আপনাকে বুদ্ধদেবের বাণী পালি থেকে অনুবাদ করে শুনিয়ে দিচ্ছি: "মাতা যেমন প্রাণ দিয়াও নিজের এক-

পুত্রকে রক্ষা করেন এইরূপ সকল প্রাণীর প্রতি অপরিমাণ দয়া-ভাব জন্মাইবে, ঊর্দ্ধদিকে, অধোদিকে, চতুর্দ্দিকে সমস্ত জগতের প্রতি বাধাশূন্য, হিংসাশূন্য, শত্রুতাশূন্য মানসে অপরিমাণ দয়াভাব জন্মাইবে। কি দাঁড়াইতে কি চলিতে কি বসিতে কি শুইতে যাবৎ নিদ্রিত না হইবে এই মৈত্রভাবে অধিষ্ঠিত থাকিবে ইহাকেই ব্রহ্মবিহার বলে।" বুদ্ধদেব বলেছেন:

মাতা যথা নিযং পুত্তং আযুসা একপুত্তম মুরক্খে এবম্পি
সর্ব্বভূতেসু মানসম্ভাবযে অপরিমাণং মেত্তঞ্চ
সর্ব্বলোকম্মিং মানসম্ভাবযে অপরিমাণং উর্দ্ধং
অধো চ তিরিযঞ্চ অসম্বাধং অবেরম সপত্তং
তিঠ ঠঞ্চরং নিসিন্নো বাসযানোবা যাবতস্স বিগতমিদ্ধো
এবং সতিং অধিটঠে যং ব্রহ্মামেতং বিহারমিধমাহু।

শোভনেন্দু বললে, মহারাজের কি দয়া তা মুখে বলা যায়না তা এত মধুর এত নিঃশব্দ এতই হৃদয়ের জিনিষ, ভাষার অতীত। এবছর পুজোয় শেষ মুহূর্ত্তে হরিঠাকুরের বাসে খুব তাড়াতাড়ি দেওঘর আশ্রমে চলে আসি, আসবার ঠিকই ছিলনা। একদিন মহারাজকে প্রণাম করবার জায়গায় একটি ছোট্ট ছেলে জুতো পরে আসছিল। খুব কচি বাচ্চা, হয়তো তার পায়ের জুতোটা বড়রা খুলে দে'ননি ঠিক সময়ে। একজন ভলান্টিয়ার তাড়াতাড়ি তাকে মহারাজের রাস্তা থেকে সরিয়ে দিতে যেয়ে অতর্কিতে ধাক্কা লেগে ছেলেটি পড়ে গেল! তখন মহারাজ তার দিকে এমন করুণ দৃষ্টিতে চাইলেন যে, কেবল

শিশুসাথী শ।শামঙাবাজ

সেই চাওয়াটুকু দেখতে পেয়েই আমার শত অসুবিধা সহ্য করে দেওঘর আসা সার্থক হ'য়ে গেল।"

চরিতামৃতে পড়ি, গম্ভীরা লীলায় মহাপ্রভুর বারো বছর লেগেছিল শ্রীরাধার বিরহসাগর যে কেমন ছিল তার একটু আভাস জীব জগতে প্রকাশ করতে।

"গম্ভীরা ভিতরে গোরা রায়।
জাগিয়া রজনী পোহায়॥
যামিনী জাগি জাগি জগ-জীবন
জপতহি যদুপতি নাম
যাম যাম যুগ যৈছন জাগত
জর জর জীবন মান॥"

হে পরম করুণাময়! সেই প্রেম বিকল দৃষ্টি, যুগ যুগ বিনিদ্র রজনীর সেই বিরহ অশ্রুসিক্ত আঁখির চাওয়া প্রতিটি জীবের উপর তোমার প্রতি নিমেষেই বর্ষিত হচ্ছে। আমরা স্তব্ধ হয়ে সেই দৃষ্টি স্মৃতির ধ্যানে কিছুক্ষণ বিমনা হয়ে রইলাম। শোভনেন্দু খুব ভাগ্যবান সে নানা অবস্থায় নানা সময়ে মহারাজের সঙ্গ করেছে। সে বলতে লাগল, "কয়েক বছর আগে মহারাজের যখন খুব অসুখ হয়েছিল, কলকাতার বাগবাজারের স্বর্গীয় কিরণ বাবু যেবার অসুখের সময় প্রাণভরে সেবা করেছিলেন। তখন মহারাজ একেবারে ক্ষীণ, দুর্ব্বল। তাঁর রোজই জ্বর আসছে, ডাক্তারের কথা বলা বারণ। তবু দূর দূরান্তের ভক্তরা দেখতে আসছেন। তাদের দিকে কথা

বলতে না পেয়ে তিনি এমন করুণ দৃষ্টিতে চাইছেন যে, আর কারো কিছু চাইবার থাকছে না। সেই চাওয়াটুকু ধ্যান করতে করতে তারা বাকী জীবনটুকু কাটিয়ে দিতে পারে। তাহলেই দেখুন, যিনি নিজের একটি মাত্র চাহনী দ্বারা এত প্রেম দিতে পারেন তিনি কী আকর্ষণ! তাই এত লোক ছুটে এসেছে। দিন দিন লোকের ভীড় আরও বাড়ছে। আরও বাড়বে। আক্ষেপ করে লাভ নাই, এই ভীড় ঠেলেই তাঁর সঙ্গ করতে হবে।"

নীরজ বাবুর স্ত্রী বললেন, "কিন্তু এই ভীড়ের মধ্যে আমরা তাঁকে পাব কি করে? তোমার কী মনে হয়? এই ভীড় ঠেলা কি সোজা!"

এ প্রশ্ন অনেকের কাছে শুনেছি, অনেকবার শুনেছি। আমার মনে হয় এর একমাত্র উত্তর, আমরা তাঁকে তাঁর কীর্ত্তনের মধ্য দিয়ে পাব। যা দিয়ে সব চেয়ে সহজে অসংশয়িতরূপে অমোঘরূপে মানব হৃদয়কে স্পর্শ করা যায় মহারাজ তাঁর বাণী প্রচারের যন্ত্রহিসাবে তাই তো বেছে নিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সঙ্গীতের এই সর্ব্বকালের সর্ব্বলোকের চিত্ত স্পর্শ করবার ক্ষমতা সম্বন্ধে লিখে গেছেন: "সঙ্গীত চিরকালের! বেদ উপনিষদের যুগের ঋষিরা গভীর ধ্যানের দ্বারা জানতে চাইলেন সংগীতের মূল কোথায়? কেনই বা তা মন এত আকর্ষণ করে এবং কেন সংগীতে একটা অনির্দ্দেশ্য আবেগে প্রাণ পূর্ণ করে তোলে ও মন উদাস করে। চিন্তার গভীর স্তরে নেমে

গিয়ে তাঁরা একদিন অনুভব করলেন যে, সৃষ্টির গভীরতার মধ্যে যে একটি বিশ্বব্যাপী প্রাণকম্পন চলেছে গান শুনে সেইটারই বেদনা বেগ যেন আমরা চিত্তে অনুভব করি। তাঁরা আরও জানলেন যে, সমস্ত মানবজীবন ও অনন্তের রাগিণীতে বাঁধা একটি সংগীত ছাড়া আর কিছুই নয় এবং সূর্য্য চন্দ্র তারা ওষধি বনস্পতি সকলেই এই বিশাল বিশ্বসংগীতে নিজের একটা না একটা বিশেষ সুর যোগ করে দিয়েছে। আমি দেখেছি গানের সুর জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঠিক ভালো করে বেজে উঠলেই এই জন্ম মৃত্যুর সংসার, এই আনাগোনার দেশ এই কাজকর্ম্মের আলো আঁধারের পৃথিবীটি বহুদূরে যেন একটি পদ্মানদীর পর-পারে গিয়ে দাঁড়ায়। সেখান থেকে সমস্তই যেন ছবির মত বোধ হতে থাকে।" (রবীন্দ্র সঙ্গীত—শান্তিদেব ঘোষ প্রণীত) মহারাজের সমস্ত দৃশ্যমান জীবনের প্রতিটি কাজই যেন এক একটি সঙ্গীত। যজ্ঞের সময়ে তাঁকে দেখতাম যখন যজ্ঞশালায় পূর্ণাহুতির আয়োজন চ'লেছে, কতবড় একটা গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত্ত! আমাদের উত্তেজনায় হৃৎস্পন্দন দ্রুততর হয়ে উঠেচে। প্রকাণ্ড বড় লোহার হাতা, শক্ত তারে বেঁধে রাখা হয়েছে। তারই এক প্রান্তে আহুতির হবি ঢেলে দেওয়া হবে। আর মহারাজের কুসুম সুকুমার হাত দু'খানি দৃঢ় মুষ্টিতে সেই লোহার হাতলখানি ধরে স্থির রয়েচে। সেই যে উত্তররাম চরিতে পড়েছিলাম। "বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূণিকুসুমাদপি..." ঠিক কি এই ছবিখানি দেখেই লেখা হয়েছিল! মহারাজ শান্ত ধীর! এরই

মধ্যে আশ্রম সংলগ্ন ভোজনশালায় খাবার ঘণ্টা পড়ল, ভক্তেরা অনেকেই চলে গেলেন। একটু সময় বাকী আছে শুভমুহূর্ত্তের। অমৃত যোগে পূর্ণাহুতি হবে। এইটুকু সময়ের মধ্যে আশ্রমের একজন পুরাণ সেবক তার ছেলেটির হাতে খড়ি মহারাজকে দিয়ে দেবার জন্যে অনুরোধ করলেন। কল্যাণ করবার কি আর সময় অসময় আছে! মহারাজ সেই সময়টুকুর মধ্যে আনুষ্ঠানিক ভাবে যা কিছু করণীয় কৃত্য সমস্ত করে নিয়ে ছেলেটির হাতে খড়ি দিয়ে দিলেন। কোন ব্যস্ততা নেই, প্রত্যেকটি মুহূর্ত্ত স্বয়ং সম্পূর্ণ। শাস্ত্রে যে বলে "ক্ষণ ব্রহ্মই সৃষ্টি!—" মহারাজের মধ্যে তাঁরই প্রকাশ। জীবের সকল কার্য্যই প্রবাহের আকারে চলে। এর পর কি হবে? তারপর এটা করে ফেলতে হবে! কত জল্পনা কত তাড়া কত ব্যস্ততা! কিন্তু মহারাজের প্রত্যেকটি কাজ প্রতিটি মুহূর্ত্তের শতদলে স্বয়ংসম্পূর্ণ! যা হচ্ছে তাই যেন সৃষ্টির সর্ব্বোত্তম সার্থকতা! প্রতিটিক্ষণ এক একটি পূর্ণপ্রস্ফুটিত পদ্মদল। শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন: "সাধুর সঙ্গে দর্শটা ধর্ম্ম সম্বন্ধে কথাবার্ত্তাবলাই সৎসঙ্গ নয়। সাধুর নিকটে থেকে তাঁর সমস্তগুলি কার্য্যকলাপ, আচার ব্যবহার খুব ধৈর্য্যের সহিত ধীর ভাবে দেখে যেতে হয়। কখন তিনি কি করেন, কার সঙ্গে কোন অবস্থায় তিনি কিরূপ ব্যবহার করেন, তিনি কি প্রকারে সময় অতিবাহিত করেন। সাধুদের এ সমস্ত কার্য্যে নিয়ত মনোযোগ থাকলে চিত্ত তাতে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে, ধীরে ধীরে নিজের দিকে যাহা কিছু ত্রুটি আছে ধরা পড়ে

ও তাতে ধিক্কার জন্মে। সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির এ সমস্ত বিকৃত ভাবও নষ্ট হয়ে যায়।"

যজ্ঞের সময় দু'টি জিনিষ খুব ছোট হলেও আমার মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। পূর্ণাহুতির সময় অতিবৃহৎ লৌহময় হাতলের মুখে যখন টিন থেকে ঘী ঢালা হচ্ছে তখন তাতে একটি শালপাতার টুকরো ছিল, যজ্ঞমন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে মহারাজ অতি সন্তর্পণে সেটি বার করে ফেলে দিলেন। চরমতম গভীর মুহূর্ত্তেও অতি তুচ্ছ ঘটনার দিকে তাঁর সমানই মনোযোগ থাকে। আর একটি হচ্ছে, হাজার হাজার নরনারী তাঁকে প্রণাম করছে, তাঁর ঘরের সুমুখের বারান্দায় কত কাজের ভীড়! তার উপর এজগত ছেড়ে কোনখানে কোন উচ্চলোকে তাঁর চিত্ত-মন সর্ব্বদাই বিহার করে, তবু চলে আসবার সময় গৈরিক উত্তরীয়ের প্রান্তে বাঁধা চাবিটি দিয়ে যখনই নিজের ঘরে তালা দিয়েছেন, চাবি বন্ধ করবার পর প্রত্যেক বার তালাটি টেনে দেখেছেন ঠিক বন্ধ হয়েছে কিনা। প্রতি সামান্য ঘটনায় তাঁর পূর্ণ প্রজ্ঞা পূর্ণ দৃষ্টি যেমন আছে ঠিক তেমনই আছে অতি বৃহৎ ব্যাপারের উপর। যিনি পূর্ণ, তাঁর সকলই পূর্ণ। তার বিভাগ হয় না বা তারতম্য হয় না। জীবনের প্রতি ঘটনায় প্রতি কাজে সেই পূর্ণেরই প্রতিবিম্ব।

"ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।"

*   *   *   *

আজ ১লা জানুয়ারি। নববর্ষ ইংরিজী হিসাবে। বাংলা নববর্ষে ১লা বৈশাখের আগের দিন মহারাজের কাছে থেকেও, ভাগলপুর থেকে চ'লে আসতে হ'য়েছিল। সে জন্যে আজ খুব আনন্দ হয়েছিল আজ তাঁকে প্রণাম করতে পাব। আজ মহারাজ একটা মালা শোভনেন্দুকে একটা মালা আমাকে দিয়েছিলেন। মালা পেয়ে খুব আনন্দ হ'লো, লজ্জাও হয়েছিল। গীতামুখে শ্রীভবান প্রতিজ্ঞা করেছেন:

যে আমাকে যে ভাবে উপাসনা করবে আমিও
তাকে সেই ভাবে ভজনা করব।*
"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে
তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্"

মহারাজ সেই কথা অনুসারেই চলেন। যাঁরা তাঁকে মালা দেন তিনিও তাঁদের মালা দেন। আমরা তো তাঁকে মালা দিইনি। ভগবানের গলায় মালা দিতে কার না সঙ্কোচ হয়। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে আছে: আমরা ভগবানের দাস এই অভিমান এই ভাবই সবচেয়ে ভালো। তবে বাবু মাঝে মাঝে চাকরের সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে হয়তো বলেন, "আয় আমার কাছে এসে এই ফরাসের উপর বোস, লজ্জা কি, তুইও যে পদার্থ

আমিও তাই। ইচ্ছা হয়তো আমার এই আলবোলার নল নিয়ে তামাক খা।"

কিন্তু তাই বলে কি চাকর আগে ভাগে যেয়ে তাঁর গদীর উপর উঠে ব'সবে। দু'একবার বিশেষ কোন উৎসবের দিনে মহারাজের শ্রীচরণে ফুল বা ফুলের মালা দেওয়া ছাড়া জীবনে কখনো তাঁর গলায় মালা দেবার কথা মনেও ওঠেনি। একদিন শোভনেন্দুর সঙ্গে এই নিয়ে কথা হয়েছিল। আমি বলেছিলাম, তুই কেন ভাই মহারাজের পায়ে মালা দিসনা; শোভনেন্দু বলেছিল "গলায় মালা দিলে মনে হয় যেন বিশেষ একটা স্নেহের ডোরে তাঁর সঙ্গে বাঁধা পড়লাম।" তারপর কিছুকাল পরে বললে, "না তোমার কথাই ঠিক। মহারাজের শ্রীচরণেই আমাদের ফুলমালা দেওয়া উচিত।" সেই থেকে আমরা মালা কখনই প্রায় দিতাম না। আজ না দিয়েই পেলাম, মনের ভিতর নিশ্চয় খুব বাসনা হ'য়েছিল। তিনি তো কারো কামনা অপূর্ণ রাখেন না। বাড়ী এসে কিছুক্ষণ পর দেখলাম পূজার ঘরে মহারাজের ছবির গলায় শোভনেন্দু সেই মালাটি পরিয়ে দিয়েছে। আমি বললাম, এ কেন করেছিস ভাই? যদিও মহারাজের গলার মালা, তবু তো তিনি আমাদেরই গলায় পরিয়ে দিয়েছিলেন। সেই জিনিষ নিয়ে আবার তাঁর ছবিতে দেওয়া। ঘট পট ছায়া কায়া সব সমান। একথাটা একজন আমার মনের মধ্যে গেঁথে দিয়েছিলেন। আমার একজন পিস্তুত দাদা শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে সন্ন্যাসী হ'য়েছেন, তিনি প্রায়ই

আমাদের বাড়ী আসতেন। আমার ছেলেটি ছোট তখন। সে ঠাকুর দেবতা নিয়ে পূজো পূজো খেলা করতে খুব ভালোবাসত। একদিন 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রিকা থেকে একটি খুব সুন্দর শিবের ছবি কেটে নিয়ে সে তার খেলা ঘরে টাঙ্গিয়েছে। সেখানে তখন রোদ প্রচুর। ছবির গায়ে রোদ লাগছে। আর খোকা ঘটি ঘটি জল নিয়ে পরম আনন্দে সেই ছবির উপর ঢালছে। প্রভাকর দাদা তাই দেখে কেঁদে আকুল। আমাকে ডেকে বললেন, এ করলে তো চলবে না বোন! ছায়া কায়া ঘট পট সব যে সমান। আমি তো তাঁর চোখে জল দেখে স্তম্ভিত! ছায়া কায়া ঘট পট সব সমান এ তো শাস্ত্র গ্রন্থেই পড়েছি। কিন্তু এমন করে জীবন্ত মানবের বেদনার্ত্ত হৃদয়ের মধ্যে তার প্রকাশ তো কখনও দেখিনি? এ সব শুধু কথার কথা নয়, সাধনার দ্বারা এই বিশেষ অবস্থা জীবন্তভাবে উপলব্ধি হয় একথা তাঁকে দেখে বুঝলাম। কোলের ছেলেটিকে রোদে পুড়ে জলে ভিজতে দেখলে মা'র মনে যেমন কষ্ট হয় সেদিন তাঁরও মাসিক পত্রিকা থেকে কেটে নেওয়া ঐ শঙ্কর মূর্ত্তির উপর খোকার ছেলেমানুষী উৎপাতে তেমনই কষ্ট হ'য়েছিল। আমাদের কাছে যা ছবি মাত্র তাঁর কাছে তা শরীরী। হাজার শাস্ত্রব্যাখ্যা পড়ে যা না হোত ঐ একটি ঘটনায় তার বাড়া হয়েছে। আজও সেই স্মৃতি আমার মনে চির জাগরূক। মনে হয় আমরা অনুভব করতে না পারলেও যাঁরা সাধনার দ্বারা তাঁকে বোধে বোধ করেছেন তাঁদের সাক্ষ্য অনুসারেই বুঝতে

পারা যায় ঘট পট ছায়া কায়া সব সমান। কোথাও ভেদ নেই। তিনিও যা, তাঁর মূর্ত্তিও তাই।

শোভনেন্দু বললে, তাতে আর কি হয়েছে? মহারাজের প্রসাদী মালা তাঁরই ছবিতে দিয়েছি।

কিন্তু তবু আমার মনে মনে একটি হুল ফুটেই র'ইলো। অবশ্য প্রসাদ যে কী জিনিষ শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এক জায়গায় বলে গেছেন: "শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের সংস্পর্শ যুক্ত এই যে দন্তকাষ্ঠ দেখিতেছ ইহাও গুণাতীত ব্রহ্ম পদার্থ হইয়া গিয়াছে। তিনি যাহা কিছু ব্যবহার করেন তাহাই নির্গুণ চিৎ পদার্থ হইয়া যায়। তিনি যে অন্নভক্ষণ করেন উহা "অন্নব্রহ্ম" উহা বিগ্রহের ন্যায় চৌকিতে রাখিয়া পূজা করা যায়। তিনি যে পদার্থ, তাঁহার প্রসাদ অন্নাদিও সেই পদার্থ।" কিন্তু মহাপ্রসাদ লোকে শুষ্ক করে রেখে দেয়। সব সময় তার দু'একটি কণা গ্রহণ করতে পারা যায়। মহারাজ আজ পর্য্যন্ত যত মালা দিয়েছেন সমস্ত শুকিয়ে নিয়ে আমি রেখেছি। তাঁর প্রসাদী মালা তো আর শুধু ফুলের মালা নেই তা চিন্ময় বস্তু হয়ে গেছে। কিন্তু তবু যে মালা নিজেদের গলায় পরে এতটা পথ এলাম আবার তাই নিয়ে তাঁর ছবিতে দেওয়া খানিকক্ষণ পর ঘুরে ফিরে এসে দেখি শোভনেন্দুই বোধ হয় ছবি থেকে মালাটি খুলে নিয়ে রেখেছে। বাঁচা গেল। জানিনা এগুলো আমার মনের কুসংস্কার বা শুচিবাই কিম্বা, হয়তো তা-ই। এক সময় মহারাজের গলায় মালা দেওয়ার প্রচলন নিষেধ

শোভনেন্দু বলেছিল : তাঁর গলায় মালা দিলে মনে হয় যেন বরণমালায় বাঁধা পড়লাম। কিন্তু এ বিষয়েও শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুর একটি কথা আমার বেদ বাক্যের মত মনে হয়। গোস্বামী প্রভুর পুত্র শ্রীযোগজীবন গোস্বামী প্রভুপাদকে একবার জিজ্ঞেস করেছিলেন :

"গুরুতে প্রেম হয় কিরূপে ?"

বিজয়কৃষ্ণ বলেছিলেন : "মায়িক সম্বন্ধের গন্ধ মাত্র থাকতে গুরুতে প্রেম সম্ভব নয়।"

অথচ আমাদের মায়িক সম্বন্ধ এখনও কত বেশী। আমাদের কী অধিকার বরণমালা গাঁথবার! আমরা খুব বেশি পারিতো তাঁর শ্রীচরণে ফুল তুলসী দিতে পারি। তার বেশি এ জন্মে এ দেহ মন নিয়ে নৈব নৈবচ।

* * * *

২রা জানুয়ারি, মহারাজের শুভ জন্মোৎসব উপলক্ষে আজ তাঁর আঠারো বাড়ী হাউসে শুভাগমন হবে। ঠিক হলো, ২রা জানুয়ারি হোম করে তিনি বেলা দশটার সময় ১নং রোল্যাণ্ড রোডে এক ভক্তবাড়ী যাবেন, সেখানে দিনের কীর্ত্তন করে, বিকেল বেলায় আঠারো বাড়ী হাউসে তাঁর শুভপদার্পণ হবে। আজ রোল্যাণ্ড রোডের কীর্ত্তনে শেষের দিকে মহারাজ যখন দাঁড়িয়ে উঠে "বলো হরে কৃষ্ণ হরে রাম নিতাই গৌর রাধেশ্যাম" ইত্যাদি গাইছেন তখন হঠাৎ একটি ছোট মেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেল। তার মা ভীতিব্যাকুলা হয়ে আর্ত্তস্বরে কেঁদে উঠলেন।

কেউ কেউ মেয়েটির মাথায় জলও পাখা দিতে লাগলেন, কিন্তু মহারাজ একবার মাত্র চেয়ে দেখে যেমন কীর্ত্তন করছিলেন করে যেতে লাগলেন। যেন কিছুই হয় নাই। হরিনামের স্রোত যেখানে বয়ে চলেছে সেখানে সেই স্রোত রাশির গতিপথ বন্ধ হলেই অকল্যাণ। আরও আকুল আরও উদ্দাম হোক তার স্রোত, আপনিই বর্হিজগতের সমস্ত অশুভ মুছে যাবে। অল্প-ক্ষণের মধ্যেই মেয়েটির জ্ঞান হলো। প্রসাদ দেবার সময় মহারাজ সস্নেহে একবার তার মাথায় হাত দিলেন। যে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা দুর্ঘটনার মধ্যেও মহারাজের এই শান্ত, নির্ব্বিকার, নিস্পৃহ আচরণ শুনেছি। সৌরজগতের অগণ্য মণ্ডলীতে মহারুদ্র শক্তিতে গ্রহনিচয় আবর্ত্তিত হয়ে চলেছে,—কিন্তু বাইরে অতিশান্ততার রূপ। নক্ষত্র খচিত আকাশের শান্ত চন্দ্রাতপতলে বসে কার মনে হবে তাদের সেই অগ্নিলীলার অপরিমেয় শক্তি। শুনেছি দার্জ্জিলিংয়ে যেবার বিরাট প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় ল্যাণ্ড-শ্লাইড ইত্যাদি হয়, মহারাজ তখন দার্জ্জিলিংয়ে। তিনি ভক্ত শ্রীযুক্ত কুমুদ বাবুর দার্জ্জিলিংস্থিত সাঁ স্যু সি নামে যে বাড়ীতে অবস্থান করছিলেন সে বাড়ীতে চারিদিকে জল উঠে, ঘর পড়বার উপক্রম হয়ে গৃহবাসীদের অত্যন্ত শঙ্কার উদ্রেক করে। তাঁরা মহারাজের রুদ্ধদ্বারে ভীতিব্যাকুল হয়ে করাঘাত করেন, মহারাজ তখন নিত্য হোম করছিলেন। তিনি দরজা খুলে কেবল বললেন, "আচ্ছা আমি হোমটা শেষ করে নিই।" বলা বাহুল্য সে বাড়ীর বা গৃহবাসীদের কারোই কোন ক্ষতি হয়নি।

মনে হয় এ সব ঠিক বিভূতি নয়। কারণ মহারাজ মাধুর্য্যময়, তিনি কখনও ইচ্ছা করে কিছু প্রকাশ করেন না। তবে যিনি ভগবানেতে সর্ব্বদাযুক্ত বা ভগবত্তার সহিত যাঁর অভিন্ন অস্তিত্ব তাঁর মাধুর্য্যের পিছনে পিছনে ঐশ্বর্য্য ক্রীত দাসীর মত চ'লে। তিনি যেখানে তাঁর সকল মধুরতা লয়ে বর্ত্তমান সেখানে নিত্য-কল্যাণও বর্ত্তমান। নিত্য ঐশ্বর্য্যও সেখান থেকে ছাড়া নয়। তবে সে মাধুর্য্যের অবগুণ্ঠনে নিঃশব্দে আপন সেবা করে।

বিকেল বেলায় মহারাজ আঠারো বাড়ীতে এ'লেন। এখানেই জন্মোৎসব হবে। কারণ বাড়ীর ভিতরে এত বড় কম্পাউণ্ড আর এত বেশি লোককে স্থান দেবার মত স্থান কলকাতার আর কোন ভক্ত বাড়ীতে বিরল। ৬ই জানুয়ারি এবার সেই শুভক্ষণ শুভশুক্লা দশমীবিদ্ধ একাদশীতিথি পড়েছে। আর চারদিন পরেই এই শুভদিন, ভক্তদের হৃদয়ে আনন্দ ধরেনা আঠারো বাড়ীর সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণে জন্মোৎবের বেদী উচ্চ করে বাঁধান হচ্ছে, সভা সাজান হচ্ছে, চন্দ্রাতপ টাঙ্গানো হয়েছে। সেখানেই কীর্ত্তন হ'তে থাকল। খোলা জায়গা একদিন সকালে কীর্ত্তনের সময় এক পশলা বৃষ্টির মুখর শব্দ খোল করতালের শব্দের সঙ্গে এসে মিশল। আবার একটু পরে মেঘছিন্ন আকাশের অরুণালোকের আভা মহারাজের আরক্তিম শ্রীমুখ মণ্ডলে এসে পড়লো। কীর্ত্তন খুব জমেনি। উৎসব যত অগ্রসর হয়ে আসছে, মহারাজ ততই অন্তর্মুখ হয়ে পড়ছেন। উৎসবের আগের দিন রাত্রিতে কীর্ত্তনের সময়।

"দীননাথ, দীন বন্ধু নাম ধরায়া কৈসে !
দ্রৌপদীকী লাজ সভা বিচমে লেনে লাগে যব
খিঁচ খিঁচকর হার গয়ে, চীর বাড়ায়া কৈসে, চীর বাড়ায়া কৈসে॥"

গাইতে মহারাজের কণ্ঠস্বর বাষ্পরুদ্ধ হয়ে গেল, তিনি থেমে গেলেন, আর গাইলেন না। অজিতের দিকে চেয়ে ইঙ্গিতে বললেন, "নাম ধরো।"

৬ই জানুয়ারি ১৯৫২ আজ দশমীবিদ্ধ পুণ্য-একাদশী তিথিতে শ্রীশ্রীমহারাজের শুভ জন্মতিথি। আঠারো বাড়ীর বিরাট মুক্ত প্রাঙ্গণে জন্মতিথি উৎসবের জন্য চন্দ্রাতপ খাটিয়ে চারিদিক সুসজ্জিত করে স্থান তৈরী হয়েছিল। সভার একাংশে সুউচ্চ বেদী তৈরী করে অশোক চক্র ফুলসজ্জায় নির্ম্মিত হয়েছিল। অশোক চক্রের নীচে কীর্ত্তনের আসন হয়েছিল। বেদীর উপর শ্রীশ্রীবালানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের বিরাট তৈলচিত্র অপরূপ ফুল সাজে সজ্জিত হয়ে স্থাপন করা হয়েছিল। তাঁর তৈলচিত্রের সামনে হোমের এবং শ্রীশ্রীগুরু পূজার সর্ব্ববিধ আয়োজন সযত্নে রক্ষিত ছিল। আজকের এই শুভলগ্নে শ্রীশ্রীমহারাজের আট-চল্লিশ বৎসর বয়সপূর্ণ হলো। সেজন্যে ৮।১০ বছরের আটচল্লিশটি কুমারী মেয়ে গৈরিকবস্ত্র পরে, ফুলমালায় সেজে মাঙ্গলিক চিহ্ন, কেউ পূর্ণ কলস কেউ শঙ্খ কেউ ধূপ দীপ কেউ পুষ্পভার বহন-করে গান গাইতে গাইতে অগ্রসর হয়ে মহারাজকে বরণ করে সভামণ্ডপে নিয়ে এ'লো। তিনি প্রায় ন'টার সময় ত্রিতলে তাঁর কক্ষ থেকে সভা মণ্ডপে নেমে এলেন। স্বেচ্ছাসেবক এবং

স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনীরা সযত্নে সভার শৃঙ্খলা রক্ষা করছিলেন। মেয়েদের জন্য নির্দ্দিষ্ট অংশে মেয়েরা ফুলমালা হাতে সার দিয়ে লাইন করে দাঁড়িয়েছেন। একের পর এক যেয়ে মহারাজকে প্রণাম করবেন, তাঁর গলায় মালা দেবেন। পুরুষদের সারিতে তাঁরাও ফুলের মালা নিয়ে সেইভাবে দাঁড়িয়ে রয়েচেন। মহারাজ প্রায় ন'টার সময় সভাবেদীতে এসে প্রবেশ করা মাত্র উলুধ্বনি, শাঁখ, জলধারা নানা মাঙ্গলিক আয়োজন ও অভ্যর্থনার সাড়া পড়ে গেলো। তারপর তিনি শ্রীশ্রীবালানন্দ মহারাজের প্রতিকৃতির সম্মুখে বসে হোম এবং শ্রীশ্রীগুরু পূজা এবং পূজান্তে আরত্রিক করলেন। এরপর ঠিক দশটার সময় তিনি আসনে বসলেন। আরম্ভ হলো প্রণামের পালা। আমি সেদিন মহিলাদের অংশে যাতে সুশৃঙ্খলায় সকলে নির্দ্দিষ্ট প্রবেশ পথ দিয়ে প্রবেশ করতে পারেন এবং প্রণামঅন্তে বহিরাগমনের পথ দিয়ে স্বচ্ছন্দে বাহির হয়ে যেতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছাসেবিকা হয়েছিলাম। ঘড়িতে দেখেছিলাম দশটা থেকে চারটে বেজে পাঁচ মিনিট অবধি এই প্রণামের প্রবাহ চলেছিল। মহারাজ একাসনে এই ছ'ঘণ্টা বসে প্রণাম নিয়েছিলেন এবং ফুল মালার বিনিময়ে প্রত্যেক্যের গলে পুষ্পমাল্য এবং ললাটে যজ্ঞ বিভূতির তিলক পরিয়ে দিয়েছিলেন। অজস্র নরনারীর সমাগম হয়েছিল। সকলের মনে সে কী আকুল আগ্রহ কেমন করে এই দারুণ ভীড় ঠেলে মহারাজের কাছে যেয়ে পৌছাতে পারবে। অনেক স্কুল কলেজের মেয়েরা সকাল আটটা সাড়ে সাতটা

থেকে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ফুলের স্তবক, ফুলের মালা, কেউ কোন উপহার হাতে নিয়ে ক্রমশঃ ভীড় বাড়ছে, একটা বাজলো, দেড়টা বাজলো, প্রায় দুটোর কাছাকাছি, তবু তারা পথ পায় না। সামনে তখনও লোকারণ্য। কত মেয়ে কেঁদে ফেললো। তারা বলতে লাগলো, কী করে আমরা মহারাজকে প্রণাম করবো ? আর তো আমরা দাঁড়াতে পারছিনা, ক্ষিধেয়, তেষ্টায় অস্থির হয়ে গেছি। আর কি মহারাজ শেষ পর্য্যন্ত এত লোকের প্রণাম নেবেন ? আর একটু পরেই হয়তো তিনি উঠে চলে যাবেন। আমাদের এত সাধ এত আশা এত প্রতীক্ষা সবই কি বৃথায় যাবে ?

সাধ্যমত তাদের অনেক বোঝালাম। বল্লাম ঃ একটি প্রাণীরও প্রণাম বাকী থাকতে তিনি উঠবেন না। আর জানতো মহাভারতে আছে পঞ্চপাণ্ডবেরা বলাবলি করেছিলেন ঃ কৃষ্ণের মনে কোন দিন দুঃখ দিওনা ভাই, যা তাঁকে দেবে শতগুণ হয়ে তাই আবার আমাদের কাছে ফিরে আসবে। তাঁর দিকে যদি আমরা একপা এগিয়ে যাই তিনি সাত পা এগিয়ে এসে আমাদের হাত ধরেন। তাঁর জন্যে তোমরা যে এত কষ্ট করেছ, এই যে চোখের জল ফেলছ, যখন তাঁকে প্রণাম করবে তখন শতগুণ আনন্দের মাণিক হয়ে তোমাদের মনকে যে একেবারে ভরে দেবে। আর একটু ধৈর্য্য করে অপেক্ষা কর। এর মধ্যে কিছু কিছু অপ্রীতিকর ঘটনাও মনকে খুব আঘাত করতে লাগলো। যেখানে বিরাট জনতা সেখানেই প্রয়োজন বিশাল ধৈর্য্য এবং

অটুট শৃঙ্খলা কিন্তু মাঝে মাঝে সমস্ত নিয়মের বন্ধন ছিন্ন করে এক একজন গণ্যমান্য লোক তাঁদের সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে জোর করে লাইন অতিক্রম করে প্রণাম করতে ঢুকে পড়তে লাগলেন। তখন এই ছোট ছোট কচি কচি মেয়েদের, অনেক নিঃশব্দ প্রতীক্ষাচারিণী অল্পবয়সী মেয়েদের এবং বৃদ্ধা মায়েদের কথা মনে পড়ে মহা-রাজেরই শ্রীমুখের শোনা গানটি মনের মধ্যে অনুরণিত হ'চ্ছিল :

"তবু যদি পাই বক্ষে তোমায়
কোন পুণ্যের ক্ষণে
কহিব সবারে ডাকিয়া তখন
ধনগর্ব্বিত অন্ধজনে
তোমারই প্রেমের একটি মাণিক
সপ্ত রাজার ধনে
দৈন্য মোদের দিয়াছে ঘুচিয়া
একটি রাতুল কণে
মহান গরবে কহিব তখন
মোহন জীবন স্বামী
ধনীদের তুমি কেহ নহ প্রভু
নিঃস্বের রাজা তুমি।"

আবার তখনই মহারাজের দিকে তাকিয়ে সব ক্ষোভ সমস্ত বিচার বিতর্ক মুহূর্ত্তের মধ্যে নিভে যাচ্ছিল। ঐ তো মহারাজ বসে আছেন, স্থির ধীর অচল অটল সুমেরুবৎ। ক্লান্তি নেই, জ্যোতিতে সমস্ত মুখলাল অরুণাভ হয়ে উঠেছে। সমানভাবে সবারই গলায় মালা দিয়ে যাচ্ছেন ও সামনের পাত্রে রাখা

হোম বিভূতির তিলক পরিয়ে দিচ্ছেন। তাঁর প্রসন্ন সমদৃষ্টির কাছে সকলেই সমান। রামপুরহাট থেকে সাঁইথিয়া যাবার পথে তাঁর শ্রীমুখ থেকে শোনা সেই কথাটি আজও আমার কাণে ধ্বনিত হচ্ছে; "ভগবানের কাছে প্রত্যেক নরনারী সদ্যোজাত শিশুর মত নির্ম্মল।"

খুব বড় পাহাড়ের চুড়োয় উঠ্‌লে নীচের সবই ছবির মত লাগে। সমস্তই যেন লীলাসুন্দরের হাতে আঁকা একটি নিখুঁত চিত্র। সে ছবির কোথায় কে এগিয়ে আছে কে পেছিয়ে আছে সে বিচার ভগবানের কাছে সম্পূর্ণ নিরর্থক। সব নিয়ে সব জড়িয়ে তিনি। এতটুকু বাদ দেবার উপায় নেই। কার সমালোচনা করব? কি নিয়েই বা ক্ষোভ করব? একজনকেও তো তিনি ফেলতে পারবেন না। একজন বাকী থাকতেও তাঁর মুক্তি নেই বা বিশ্রাম নেই। একটা বিরাট ঐক্যতানের মধ্যে সমস্ত বিচিত্র এবং বিরুদ্ধ সুরগুলিও প্রেমের যাদুতে মিশে একটি অখণ্ড সুরের একটি স্বর্গীয় সঙ্গীতের সৃষ্টি করেছে। আমাদের দেশে কবি মানে কেবল তিনি ন'ন যিনি ছন্দ মিলিয়ে মিল বাঁচিয়ে কবিতা লেখেন, কবি মানে যিনি দ্রষ্টা যিনি বিধাতার সমধর্ম্মী। তাই আমাদের কবি রবীন্দ্রনাথ লিখে গেছেন 'বলাকায়':—

"ওরে ভাই, কার নিন্দা কর তুমি?
এ আমার এ তোমার পাপ
বিধাতার বক্ষে এই তাপ
আজিকে ঘনায়!"

তবু সেই তাপকে আমি অভিনন্দন করি। এই তাপই ভগবানকে নরলীলায় আহ্বান করেছে।

"ভক্তানুকম্পয়াধৃত বিগ্রহং বৈ......"

ভক্তের প্রতি এই অহেতুক অনুকম্পা, এই ভূতানুকম্পাই ভগবানকে নিত্যসাকার নিত্যচিন্ময়নরবিগ্রহের রূপ ধারণ করিয়েছে। প্রায় একটা বেজে কুড়ি মিনিটের সময় শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মা উৎসব বেদীতে আরোহণ করলেন শ্রীশ্রীমহারাজাকে এই পুণ্যক্ষণে আশীর্ব্বাদ করতে। তিনি বেদীতে পদার্পণ করামাত্র সমবেত যন্ত্রসঙ্গীত এবং কণ্ঠসঙ্গীত মিলিত হ'য়ে "তুমি মা! তুমি মা!" ধ্বনিত হ'তে লাগল। শত শত কণ্ঠের ভক্তি এবং ভাবমিশ্রিত ব্যাকুল মাতৃআহ্বানে সমস্ত স্থানটি মুখরিত হ'য়ে উঠ্‌লো। বেদীর উপর মহারাজের আসনের পাশে মা কিছুকাল ব'সলেন! মধুর প্রসন্ন হাসিতে তাঁর সমস্ত আনন উদ্ভাসিত। মহারাজও আনন্দে হাস্যমুখ। মহারাজ তাঁর গায়ে একটি রেশমী চাদর জড়িয়ে দিলেন। একটি স্বর্ণমুদ্রাপ্রণামী দিলেন। আঠারো বাড়ীর বড় মেয়ে অমিয়া দেবী তাঁর মুখে একটি মিষ্টি ভেঙ্গে খাইয়ে দিলেন। অল্পক্ষণ পরেই আনন্দময়ী মা উৎসববেদী থেকে নেমে চ'লে গেলেন।

শেষে এমন হ'লো যে, ভারি ভারি ফুলের মালা মহারাজের গলায় ভক্তেরা দিচ্ছেন তিনি আবার তা খুলে ভক্তের গলায় পরিয়ে দিচ্ছেন. এতে তাঁর অবিশ্রান্ত মালা নেওয়া আর

মালা খুলে ফেলার ফলে চুলের জটা ছিঁড়ে যেতে লাগলো তখন প্রাণকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে মালার সুতো টেনে ছিঁড়ে মালা খুলে দিতে সুরু করলেন। আর একজন কাছে বসে মালাগুলি জুড়ে দিতে লাগলেন। অনেকেই অনুরোধ করলেন : মহারাজকে এভাবে কষ্ট না দিয়ে তাঁর শ্রীচরণে পুষ্পমাল্য অর্পণ করতে। কিন্তু দেখা গেল তাতে বড় কেহ রাজী ন'ন। সকলেই এই বিশেষ দিনে মহারাজের গলাতেই মালা দিতে চা'ন। মহারাজ অবশ্য সব সময় নীরব, নির্ব্বিকার প্রসন্নস্মিতমুখ। লোকে তাঁকে যত কষ্ট দেয় আর যত লোকের ভীড় বেশি হয়, ততই তাঁর আনন্দ উচ্ছলিত হ'য়ে ওঠে। তাঁর দিক থেকে ঠিকই হয়। সেই তো তিনি, যিনি আপামর সাধারণ সকল বয়সের সকল অবস্থার সকল শ্রেণীর নরনারী তাঁর শ্রীচরণ স্পর্শ করে প্রণাম করবে ব'লে গৌরাঙ্গ অবতারে সন্ন্যাস নিয়েছিলেন। আর কিছু না হোক সন্ন্যাসী বলেও তো সকলে প্রণাম করবে আর তাতেই জীবের অশেষ কল্যাণ হবে। অমৃতের সাগরে নিজে ইচ্ছে করেই ডুব দাও বা জোর করে ধাক্কা দিয়ে কেউ ফেলে দিক, একবার সে সাগরে পড়লেই অমৃতান্বিত হয়ে যাবে। মহারাজ তাই যত ভীড় হয়, যত নরনারী কাতারে কাতারে আসে তাঁর দর্শন, স্পর্শন শ্রীমুখের হরিনাম সংকীর্ত্তন শ্রবণ লালসায় ততই তিনি খুসী হ'ন। নিজের সুখসুবিধা আরাম স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি বিন্দুমাত্র তাঁর ভ্রূক্ষেপ

নেই। জীবের কল্যাণের জন্যই তিনি এসেছেন সেই কল্যাণ করবার কি আর সময় অসময় আছে। না আছে আরাম, বিরাম। কিন্তু আমরা তো হেরে গেলাম। আমরা মহারাজের শ্রীচরণে মালা দিলে কি ঠকে যাব? তাঁর বক্ষদেশে আর চরণকমলে কোথাও কিছু পার্থক্য আছে? "জীবের দেহদেহী ভেদ আছে, কিন্তু ভগবান বিগ্রহ বিশিষ্ট হইলেও তাঁহাতে সমস্তই সচ্চিদানন্দ, তাঁহাতে এরূপ পার্থক্য হয় না। ভগবানের যে কোন অঙ্গই যে কোন ইন্দ্রিয়ের কাজ করিতে পারে।…" এই ব'লে শ্রীমদ্ভাগবত, পুলিনভোজনলীলায় স্বয়ং সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ এই বিষয়ে যে প্রমাণ দিয়েছেন তারই উল্লেখ করে বলেছেন: "শ্রীকৃষ্ণ মধ্যস্থলে, তাঁহার চারিদিকে সখাগণ তাঁহারই দিকে মুখ ফিরাইয়া পুলিনভোজন লীলায় বসিয়াছেন। সকলেই মনে করিতেছেন,—যাঁহারা প্রভুর পশ্চাতে আছেন, তাঁহারাও মনে করিতেছেন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদেরই দিকে চাহিয়া আছেন।"

মহারাজের জ্যোতির্ম্ময় সচ্চিদানন্দ ঘনতনু বিগ্রহের প্রতিঅণু পরমাণু যে চিন্ময় এবং পূর্ণ সে বিষয়ে কি কোন সংশয়ের অবকাশ আছে! যে তাঁর কাছে এসেছে সে কোন শাস্ত্র আলোচনা না করেই দেহের প্রতি রোমে রোমে অনুভব করেছে তাঁর সবই চিন্ময় সেখানে দেহ দেহী কোন ভেদ নেই। তাঁর প্রতি অঙ্গই পূর্ণ, পূর্ণের কি অংশ হয়? তার কি বেশি কম আছে?

"ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥"

তাঁর শ্রান্তি ক্লান্তি বা বিরাম বিশ্রামও নেই। চারটে বাজবার পর প্রণাম শেষ হোল। আবার ঠিক পাঁচটার সময় শ্রীশ্রীমহারাজ দক্ষিণেশ্বরে গেছেন। শুনলাম পরের দিন সন্ধ্যাবেলায় আবার আঠারো বাড়ীর এই উৎসব মণ্ডপে মহারাজের পুণ্য জন্মতিথি উপলক্ষে সুধী সম্মেলনও ধর্ম্মমহাসভা হবে। গতবারে এই সভায় রাধাকমল মুখোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন। এবার বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতিত্ব করবেন। সভা শেষ হ'য়ে গেলে কীর্ত্তন হবে। যথাসময়ে সভা আরম্ভ হলো। মহারাজের প্রত্যেকটি আচার ব্যবহার জীব শিক্ষার জন্য। তাঁরই অগণিত ভক্ত শিষ্যদের সামনে তিনি দীন হীনের মত নীচে ব'সলেন এবং সভাপতি মহাশয়ের জন্য উচ্চ চৌকির ব্যবস্থা করলেন। যেখানে যেমন সেখানে তেমন, যেখানে যাঁর প্রাপ্য যে সম্মান তার বাহ্যিক অনুষ্ঠানেও যেন কোন খুঁত না থাকে।

সভাপতি তাঁর অভিভাষণে আজকের এই পুণ্যবাসর সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বললেন। শাস্ত্রানুমোদিত ধর্ম্মপথ কি? সনাতন হিন্দুধর্ম্ম কি? এসকল বিষয়েও কিছু ব'ললেন। শ্রীযুক্ত ভূপাল ভূষণ শ্রীশ্রীমহারাজের শুভ জন্মোৎসব যে আঠারো বাড়ীতে হ'য়েছে, আঠারো বাড়ীর এঁরা যে বহুদিন থেকে শ্রীশ্রীবালানন্দ

মহারাজের সময় থেকে কিরূপ প্রাচীন ভক্ত সেবিষয়ে কিছু বললেন এবং শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ তাঁর স্বরচিত একটি সুন্দর সুবৃহৎ কবিতা যা তিনি মহারাজের শুভ জন্মোৎসব স্মরণে লিখেছিলেন—পাঠ করলেন। তারপর মহারাজ সেই আসনে ব'সেই মাইকের সামনে তাঁর ভাষণ বললেন। তিনি কখনও ভাষণ লিখে পাঠ করেন না।

সব সময় যা মনে আসে মুখে বলে যান। বিবেকানন্দ চিকাগোর আমেরিকায় ধর্ম্ম মহাসভায় একমুহূর্ত্ত আগেও জানতেন না তিনি কী বলবেন, কিছু তৈরী করেও নিয়ে যাননি। যখনই উঠে দাঁড়িয়ে বলতে সুরু করলেন, অশ্রান্ত অজস্র বাগ্মিতার স্রোত কোথা থেকে যেন ঠেলে এলো।

রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে লিখেছিলেন: আমার শ্রেষ্ঠ রচনাগুলির একটি লাইন যদি হারিয়ে যায়, আবার ঠিক তা-ই মনে করে লিখতে পারিনে। আমার ভিতরে কে যেন সেই সময়ে রচনা করে যায়, তার উপর আমার সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব নেই। তাকেই কি তিনি জীবন দেবতা বলে সম্বোধন করে প্রশ্ন করেছেন:

"একি কৌতুক, নিত্য নূতন
ওগো কৌতুকময়ী!"

মহারাজ সেদিন প্রায় একঘণ্টা পাঁচিশ মিনিট ধরে স্বচ্ছন্দ অনর্গল অতি মধুর ভাষায় যে ভাষণ দিয়েছিলেন তা সত্যি অপূর্ব্ব হ'য়েছিল! একেই তো আমরা মহারাজকে কখনো

কিছু বলতে বিশেষ শুনতে পাইনা। তিনি যা বলেন তা গানের সুরে সঙ্গীতের ভাষাতেই বলেন। তাই সেদিন তাঁর মুখের বক্তৃতা স্তব্ধ বিস্ময়ে আনন্দে তন্ময় হ'য়ে শুনছিলাম। পরে মানসিক স্মরণের দ্বারা সেই ভাষণটির সমস্ত কথাই প্রায় লিখে নিয়েছিলাম। কিন্তু মহারাজ সেই মুহূর্তে ভাবের স্রোতে যা বলেন পরে আর তাঁর তা মনে থাকেনা। তাই তিনি সে সব পড়ে কিছু সংশোধন করে দিতে পারেন না। তীব্র মনোযোগ দিয়ে তাঁর কথা শুনে যদি কেউ তখনই তখনই তা লিখে রাখবার চেষ্টা করেন তাহলে জগতে অনেক অমূল্য সম্পদ তিনি দান করতে পারেন। শুনেছি মহারাজ রাঁচি, শিলং, দার্জ্জিলিং পুরী প্রভৃতি জায়গায় যেখানে ভীড় কম থাকে সেখানে সৎসঙ্গ বা সৎপ্রসঙ্গ করে থাকেন। কোন যথার্থ পিপাসুর আধ্যাত্মিক প্রশ্নের উত্তরে তাঁর যা বলবার বলেন। ক'লকাতাতেও কখনো কখনো হয়। আমার কখনও শুনবার দুর্লভ সৌভাগ্য হয়নি। একদিন মাত্র ট্রেণের কামরায় আট দশমিনিট শোনা ছাড়া! কিন্তু যেসব ভাগ্যবান বা ভাগ্যবতীরা শুনতে পান তাঁরা যদি লিখে রাখেন তাহলে খুব ভালো হয়।

সেদিন শ্রীশ্রীমহারাজের এক ঘন্টার উপর বলা এই শ্রীমুখের ভাষণটি যেমন লিখে রেখেছিলাম তার প্রতিলিপি দিলাম :—

৭ই জানুয়ারি, ১৯৫২ সোমবার শুক্লাএকাদশী তিথি,

আঠারো বাড়ীর উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে শ্রীশ্রীমহারাজের পুণ্য জন্মতিথি উপলক্ষ্যে মহতী সভায় মহারাজের ভাষণ :—

"অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যপ্তং যেন চরাচরম
তৎপদ দর্শিতং যেন, তস্মৈ শ্রী গুরবে নমঃ।"

মাননীয় সভাপতি মহাশয়, প্রিয় ভ্রাতৃবৃন্দ, সমবেত সভ্যগণ ও মাতৃমণ্ডলী! আমার মত একজন অকিঞ্চিৎকর অতি সাধারণ ব্যক্তির প্রতি আপনারা যে বিপুল শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেছেন এবং এই ক্ষুদ্র অকৃতার্থ মানবের জন্মদিন উপলক্ষ্যে কাল ও আজ নানা অনুষ্ঠান নানা মাঙ্গলিক আয়োজন দ্বারা আপনাদের হৃদয়ের যে ঐকান্তিক শ্রদ্ধা প্রীতি স্নেহ ভালোবাসা প্রকাশ করেছেন তাতে আমি ধন্য হ'য়েছি। আমার ন্যায় একজন অতি সামান্য অভাজন ব্যক্তির সম্মানের জন্য এই মহতী সভা, আমার মত এক জনের এই জন্ম মরণশীল নশ্বর পাঞ্চভৌতিক দেহের জন্মদিন উপলক্ষ্যে এই বিরাট অনুষ্ঠান আমাকে লজ্জিত করেছে। জন্ম হয় কার? যদিও মানব দেহ, এই ভোগায়তন পার্থিব দেহ পরিণামশীল, অনিত্য, নশ্বর তথাপি মানবের এমন একটি বৈশিষ্ট্য আছে যাতে মানব জন্মকে শুধু সুদুর্লভ নয়, সুরদুর্লভ বলা যেতে পারে। এই বিশাল পৃথিবীর তিনভাগ জল, তারপর স্থল ভাগের স্বল্প আয়তনের মধ্যেও আবার কত শ্বাপদ, সরিস্পৃপ, লতাগুল্ম, কীট পতঙ্গ পশু পক্ষী ইত্যাদি :—মানুষ সেখানে কত অল্পইনা স্থান অধিকার করে আছে। তারপরে আবার

অসীম আকাশের দিকে চেয়ে দেখতে পাই ; কত কোটি কোটি সৌরজগত, কত নক্ষত্ররাজি কত নীহারিকাপুঞ্জ ! এই দীপ্ত জ্যোতিষ্ক মণ্ডলের মধ্যে পৃথিবী কতটুকু ? আবার সেই পৃথিবীর মাঝে মানুষ কতটুকু ? কিন্তু তবু মানুষের মধ্যে এমন একটি জিনিষ রয়েছে এমন একটি সম্ভাবনা রয়েছে যা অন্য কোন প্রাণী কেন দেবতার মধ্যেও নেই। তাই মানবজন্ম শুধু সুদুর্লভ নয় সুরদুর্লভ। যখন একটি মানব শিশু জন্ম নেয় তখন অন্তরীক্ষ থেকে দেবতারাও উৎসুক হয়ে ওঠেন : কে এ'ল এই মানব শিশু ? অসীম সম্ভাবনায় পথ বেয়ে ভগবানের প্রতীক এই ক্ষুদ্র মানবের মধ্যে কিসের অভিব্যক্তি সুপ্ত হ'য়ে রয়েছে !

কিন্তু সেই বস্তুটি কি ? যা মানবকে এই বৈশিষ্ট্য প্রদান করেছে ! সেই জিনিষটি হচ্ছে মানবের বুদ্ধিবৃত্তি। ভগবান মানুষকে এই বুদ্ধি দিয়ে তাকে কর্ম্মক্ষেত্রে অসীম সম্ভাবনার পথে দাঁড় করিয়েছেন ! সে ইচ্ছা করলে এই বুদ্ধিকে শুদ্ধা-বুদ্ধিরূপে নিয়োজিত করে ভগবৎ পথে অনন্ত উন্নতির পথে যেতে পারে আবার সে ইচ্ছা করলে এই বুদ্ধির অপব্যবহার করে অনন্ত অধো-গতির পথেও নেমে যেতে পারে। পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ এদের জীবনযাত্রা কতকগুলি ইন্‌ষ্টিংক্‌ট্ বা ধরা বাঁধা স্বভাবজাত প্রবৃত্তির ধারা নির্ব্বাহ হয়। দেবতারাও static. পুণ্যের নির্দ্দিষ্ট সময় স্বর্গ ফলভোগের পর ক্ষীণপুণ্যে আবার নেমে আসতে হয় :

"ত্রৈবিদ্যাঃ মাং সোমপাঃ পূত পাপাঃ
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোকং
অশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেব ভোগান্।
তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্তলোকা বিশন্তি।
এবং ত্রয়ী ধর্ম্মমনুপ্রপন্না গতাগতং কামকামালভন্তে।"

মর্ত্ত্যলোকে আবার পতন হয়। কিন্তু মানুষের তা নয়। সে নিজে কি হবে বা হবে না আগে থেকে ছক্ কাটা নেই। সে জিনিষটা নির্ভর করছে তারই উপর! ভগবান সৃষ্টি শেষ করে নিজের প্রতিরূপ স্বরূপ মানব মনে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দিয়েছেন। সে অনন্ত অভীপ্সা অনন্ত ঊর্দ্ধাভিসারের কামনা নিয়ে জন্মেছে। সেই প্রাচীন কালের কেল্‌টিক্ যুগ বা প্রস্তর যুগের সূচনা থেকে আরম্ভ করে আজকের আধুনিক মানবের যাত্রাপথের এই নিরবচ্ছিন্ন অভিযানের দিকে চাইলে আমরা দেখি কেল্‌টিক্ যুগে যে মানব ইন্‌ষ্টিঙ্কট্ চালিত ছিল বহুল পরিমাণে আজ সে-ই তার বুদ্ধিবলে জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে প্রকৃতির সর্ব্ব বাধাকে প্রশমিত করে জয়যাত্রার পথে চলেছে। প্রকৃতিকে সে বুদ্ধির দ্বারা পরাজিত, পদানত করেছে। এই যে সুর দুর্লভ মানব জন্ম আমরা পেয়েছি কত ভাগ্যবলে। কত জন্ম কত চৌরাশী লক্ষ যোনী পরিভ্রমণ করে কখনো জলজ উদ্ভিদ কখন কীটপতঙ্গ কখন পশুপক্ষী ইত্যাদি হ'তে

হ'তে অবশেষে জন্ম পেলাম চেতনার এই পূর্ণতম বিকাশের স্তরে। অভিব্যক্ত হলাম মানবরূপে বিশাল সম্ভাবনা নিয়ে। এর অপব্যবহার যেন আমরা না করি। সেই পূর্ণ চৈতন্য কত দীর্ঘদিন অপেক্ষা করেছিলেন কখনো প্রস্তরের মধ্যে অবরুদ্ধ হয়ে কখনো শৈবালের মধ্যে প্রচ্ছন্ন হ'য়ে, কখনো সরিসৃপ কীটপতঙ্গ পশুপক্ষীর মধ্যে সঙ্কুচিত হ'য়ে। মুক্তির জন্য পূর্ণ বিকাশের জন্য কত দীর্ঘ রাস্তা অতিক্রম করে তবে তিনি মানবের মধ্যে পূর্ণায়িত হবার প্রস্ফুটিত হবার পথে এসে পৌঁছেচেন এ কী ভুলবার! (যে অগণ্য দর্শকবৃন্দ মহারাজের এই অমৃতময়ী বাণী নিস্পন্দ হয়ে শুনেছিলেন তাঁদের হয়তো মনে পড়তে লাগল, মহারাজ কীর্ত্তনের সময় রোজ গানের সুরে এই মহাসত্য নিত্য স্মরণ করিয়ে দেন :

কত জন্ম পরে নর জন্ম পেলে
বল কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
কত পশুপক্ষী কুলে বল জন্ম নিলে
বল রাম রাম হরে হরে।")

মৃত্যু যেন রাত্রি। জীবনরূপ সারাদিনের অর্জিত পাপপুণ্যের বোঝাগুলি পান্থশালার একপাশে রেখে নিশার গাঢ় অন্ধকারে আমরা শয়ন করে রয়েছি। আবার সকাল হলেই জন্ম নিয়ে এই পাপ পুণ্যের পুঁটলি পোঁটলাগুলি মাথায় করে আমাদের সুরু হবে চলা। কত যে দীর্ঘ রাত্রি দীর্ঘতর দিন এই আসা যাওয়ায় কেটে গেছে সে কথা আমাদের মনে নেই। সব ভুলে যাই।

(এখানে যে সহস্র সহস্র নরনারী উৎসুক হ'য়ে মহারাজের সুধাময়ী বাণী শ্রবণ করছিলেন, তাঁদের মনে পড়ে গেল মহারাজ কীর্ত্তনের সময় রোজ গান গেয়ে মনে করিয়ে দেন :

"বদ্ধ হয়ে কর্ম্মডোরে পাপ পুণ্য সাথী লয়ে
আসছ আবার যাচ্ছ আবার ভবের পারাবারে
এখন গতাগতি সাঙ্গ কর তাঁর চরণ ধরে
দয়াল হরিরে।")

আমরা এই যে মানব জন্ম পেয়েছি একে ধর্ম্মানুমোদিত পথে ঋষিগণের নির্দ্দেশিত শাস্ত্রানুমোদিত পথে চালনা করতে পারি যেন! মানব জীবনে ধর্ম্মানুমোদিত এবং শাস্ত্রানুমোদিত পথ কি? সেবিষয়ে কিছুক্ষণ আগেই শ্রদ্ধাস্পদ সভাপতি মহাশয় তাঁর বিশাল জ্ঞান এবং অগাধ পাণ্ডিত্য দিয়ে আমাদের বলেছেন। ভগবান এই সৃষ্টিতে আপন প্রতিরূপ স্বরূপ মানবকে গড়েছেন। মানুষের মধ্যেই তাঁর লীলা বিলাস, মানুষের মধ্যেই তাঁর রূপ। মানবের মধ্য দিয়েই নররূপে তিনি আসেন। প্রত্যেকে নিজের নিজের ভাব অনুসারে ভগবানের রূপ দেখে। তিনি Objective ন'ন, তিনি Subjective.

যে যেমন ভাবে তাঁকে দেখতে চায় তার কাছে তিনি নিজেকে সেইভাবে প্রকাশ করেন সেইরূপে ধরা দেন। তিনি ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন। তিনি নিজ স্বরূপকে আমাদের ভাবের মধ্য দিয়েই ব্যক্ত করেন। তাই পৃথিবীতে আর কিছুই তিনি তেমন চা'ননা যেমন তিনি ভাবের কাঙাল! বাইরের কোন বহুল উপকরণের দ্বারা তাঁর পূজার আড়ম্বরের

চেয়ে তিনি ভাবের ভিখারী। তিনি তাই স্বেচ্ছাময় ভগবান হ'য়েও ভক্তাধীন। পরম স্বতন্ত্র পুরুষোত্তম হ'য়েও ভক্তের কাছে একান্তই পরাধীন। মানুষে নিজের হৃদয়ের ভাব দিয়েই বিশ্বচরাচরকে দেখে। আপনারাও কেবল নিজের হৃদয়ের স্নেহ শ্রদ্ধা ও ভাবের দ্বারা আমার মত একজন অকিঞ্চিংকর সামান্য মানবকে এতটা সম্মান দিচ্ছেন তার জন্য আমি ধন্য। তবে আমার এই অকৃতার্থ জীবনেও একটি চরম সার্থকতা একটি পরম গর্ব্বের বিষয় আছে। সেটি হচ্ছে এই যে, আমার কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে আমি এক স্নেহময়, দয়াময়, জ্ঞান, প্রেম ও বৈরাগ্যের মূর্ত্তিমান বিগ্রহ স্বরূপ সাক্ষাৎ দেবতার শ্রীচরণ তলে একান্ত মনে আশ্রয় নিয়েছিলাম। কায়মনো বাক্যে তাঁর শরণাগত হ'য়েছিলাম। তাঁর জীবন বেদ তাঁর জীবনাদর্শ আমার জীবনে এখনও হয়তো সম্যকরূপে ফুটিয়ে তুলতে পারিনি তবু দৃঢ় বিশ্বাস আছে একদিন নিশ্চয় ত পারব। আর এইটুকু আশ্বাস আছে জীবনে যে পথ বেছে নিয়েছি যে আদর্শ বরণ করেছি। সেই পথ সেই আদর্শই যে মানব জীবনের শ্রেষ্ঠতম কাম্য বস্তু সে বিষয়েও কোন সংশয় নেই। এইটুকুই আমার এই সামান্য অকিঞ্চিৎকর জীবনের একমাত্র গর্ব্বের বস্তু। (এখানে যে বিশাল জনসমুদ্র স্তব্ধ হ'য়ে মন্ত্রমুগ্ধের মত মহারাজের শ্রীমুখের বাণী শুনছিলেন তাঁদের মনে পড়ে গেল মহারাজ যিনি দীননাথ, দীনবন্ধু, দীনতাই যাঁর পরম প্রিয়তম বস্তু তিনিও কীর্ত্তনের সময় গানের সুরে সর্ব্বদা গা'ন :

"প্রভু সকল গর্ব্ব ছাড়ি দিব
তবু তোমার গর্ব্ব ছাড়িব না
সবারে ডাকিয়া কহিব
যেদিন পাব তব পদরেণু কণা।"

আর মনে পড়ে গেল প্রতিদিন কীর্ত্তন সভায় মহারাজের প্রেম মধুর কণ্ঠে সেই সাক্ষাৎ শঙ্কর মূর্ত্তির বন্দনা গান ঃ—

"নিত্যানন্দং পরম পুরুষং নৈষ্ঠিক ব্রহ্মাচর্য্যে নিষ্ঠং নিত্যং
তপসি নিরতং যোগযুক্তং মহান্তং
শান্তং দান্তং পরহিতরতং সুপ্রসন্নাননং
শ্রীবালানন্দং পরম শিবদং
সদ্‌গুরুং ত্বং নমামি!)

ভগবানকে পেতে হ'লে সংসার বা সন্ন্যাস দুই-ই অবান্তর। একমাত্র প্রয়োজন তাঁর প্রতি ঐকান্তিক প্রেম!

জনকরাজা রাজর্ষি, সংসারের সকল জটিল কর্ত্তব্য এবং ভোগায়তনের মধ্যে দিয়েও নিত্য নিরন্তর তাঁর প্রতি মন ফেলে রাখতেন। সংসারীরা সংসারের নানা তাপে অনল-দগ্ধ হ'য়েও সংসারের শত কর্ত্তব্যের মাঝেও যদি তাঁর প্রতি মন ফেলে রাখে তারা ধন্য। পক্ষান্তরে স্ত্রী-পুত্র পরিজন সকলের প্রতি সব কর্ত্তব্য বিসর্জ্জন দিয়ে অরণ্যবাসী হ'য়েও যদি মানব মনে মনে ভোগাসক্তির কথা স্মরণ করে, সম্পূর্ণ বিফল তার অরণ্য বাস।

"কর্ম্মেন্দ্রিয়ানি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরণ্
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে।"

কাজেই এসব বাইরের জিনিষ, একমাত্র ভিতরের বস্তু তাঁর প্রতি প্রেম। শ্রীমন্‌মহাপ্রভুও বলেগেছিলেন ঃ

"কি কাজ সন্ন্যাসে মোর, প্রেম প্রয়োজন।"

প্রেম হ'লো সৎ আর চিৎ এই দুইয়ের মাঝখানের সেতু। যদিও সৎ, চিৎ, আনন্দ সবই এক। সবই সেই এক রসঘন শ্রীভগবানের অখণ্ড সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তি তবু বিশ্ববিধানে দেখা যায় সমস্ত জিনিষের মধ্যে দ্বৈত ভাব বা দু'টো বিপরীত শক্তি কাজ করছে। সেই দুইয়ের আকর্ষণ বিকর্ষণ সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্রতম ধূলিকণা থেকে আরম্ভ করে জ্যোতিষ্ক মণ্ডলীর মধ্যেও বর্ত্তমান।

একটা centripetal বা কেন্দ্রানুগ শক্তি আর একটা centrifugal বা কেন্দ্রাতিগ শক্তি। একদিকে প্রতি অণু পরমাণু পরস্পরকে attract করছে অন্যদিকে repulse করছে। এই আকর্ষণ বিকর্ষণ এই কেন্দ্রানুগ এই কেন্দ্রাতিগ উভয়ের মিশ্রণে পূর্ণ এক। সেই সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ ভগবান জ্ঞান ও প্রেমের মিলিত রূপ। জ্ঞান হ'লো বস্তু থেকে বাস্তবিকতার দিকে যাওয়া আর প্রেম হলো বাস্তবিকতার দিক থেকে বস্তুতে যাওয়া।

গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন এই জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির কথা

"সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।"

আবার জ্ঞানের সঙ্গে সমন্বয় করে প্রেম হ'লো কর্ম্ম। এই প্রেম বা আনন্দ ভগবানের সৎ ও চিৎয়ের মধ্যে সেতু বন্ধন করে রয়েছে। ভগবান আনন্দ স্বরূপ। শ্রুতিতে বলেছেন ঃ

"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি,
আনন্দং প্রয়ন্ত্যভি সংবিশন্তি।"

সমস্ত অখিল বিশ্বের আনন্দেই উৎপত্তি, আনন্দেই তাদের স্থিতি আনন্দেই তাদের লয়। পৃথিবীর প্রত্যেকটি প্রাণীর অস্তিত্বের মূল হ'লো আনন্দ। এই আনন্দের পিছনে পশ্চাদ্ধাবনই তার জীবনের প্রতিটি ক্রিয়ার মূলে। হতে পারে সংসারাসক্ত মানুষ এই আনন্দের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে না। তারা সেই আনন্দস্বরূপের প্রতি না যেয়ে বিভ্রান্ত পথে ইন্দ্রিয়াসক্তির পানে ছুটে চ'লে কিন্তু মূল উৎসটি তার এক। এই অভীপ্সার মোড় ঘুরিয়ে শ্রীভগবানের দিকে দিতে পারলেই মানবের যা নিত্যস্বরূপ কৃষ্ণদাসত্ব তা-ই সে লাভ করবে। ভগবানের প্রেম সদা সর্ব্বদা আমাদের ঘিরে রয়েচে। আমরা সকল সময়ে সে সম্বন্ধে সচেতন থাকি না কিন্তু তিনি ঠিকই আমাদের কোলে করে রয়েচেন। রবীন্দ্রনাথ বলে গেছেন: "আমরা আছি, একান্তই আছি, মহাকালের কোলেই শুয়ে আছি—।" যখন আমরা সংসার মোহ ঘোরে ভুলে যাই, মনে করি, বুঝিবা আমরা আর তাঁর কোলে নেই তখনও কিন্তু তিনি আমাদের কোলে করেই রয়েছেন। তিনি কখনও দূরে যান না। তিনি আছেন, একান্তই আছেন। আমাদের অতি কাছে আছেন। এই বোধে যিনি নিত্য-প্রতিষ্ঠিত তাঁকেই বিজয়লক্ষ্মী জয়মাল্য দেবেন।

আর একটি অমূল্য রত্ন ভগবান এই অধম কলিযুগে আমাদের দান করে গেছেন। সেটি তাঁর নাম। নাম নামী অভেদ। তাঁব নাম এবং তিনি এক। এই নামের গৌরবেই কলিব এত গরব। নইলে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর স্বর্ণময় যুগ। সে সব যুগের ত্যাগ, তপস্যা, সাধনা কিছুই কলিযুগেতে নাই। সে সব শ্রেষ্ঠ যুগের পর এই অধম কলিযুগে আমাদের কী সম্বল থাকত যদি তিনি নিজহতে অভিন্ন এই তাঁর নাম এ যুগে বিশেষভাবে দান করে না। যেহেতু ভগবান তাঁর নাম সঙ্কীর্ত্তন এই কলিযুগে যে ভাবে দান কবে গেছেন সে মহিমা অন্য কোন যুগকে দেন নাই। শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর তাই তাঁর প্রার্থনায় বলে গেছেন ; "প্রণমহ কলিযুগ সর্ব্বযুগ সার। যাহা হৈতে হৈল নাম সঙ্কীর্ত্তন প্রচার।" এই নামের মহিমার কথা আমি আব কি বলব! শ্রীল হরিদাস ঠাকুর তাঁর পর্ণকুটীরে বসে মালায় সংখ্যা নাম জপ করছেন। সামান্য একটী মৃৎপ্রদীপ জ্বলছে। তাঁর পরণে ছিন্নবাস। রাজা তাঁকে পরীক্ষা করতে গণিকা পাঠালেন। হরিদাস বললেন, তুমি এইখানে বসে থাক, আমার সংখ্যা নাম জপ পূর্ণ হলে আমি তোমার অভিলাষ পূর্ণ করব। বেশ্যা সেই নাম জপ প্রবাহের মধ্যে স্তব্ধ বসে রইলো। কিন্তু নামের কী শক্তি, এই রকম বসে থাকতে থাকতে তার মনের স্রোত সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে বইতে লাগলো। যে ছিল স্বেচ্ছাচারিণী সে হয়ে গেল পরমাব্রতধারিণী। মস্তক মুণ্ডিত করে চীর বাস ধারণ করে সে তুলসী কানন সেবা

করতে আরম্ভ করলে! সে হয়ে গেল পরম বৈষ্ণবী। তাকেই দর্শন করবার জন্য তখন

"বড় বড় মহান্তি আসে বৈষ্ণবী দরশনে!

সুবুদ্ধি খাঁ ঘোরতর পাপ করেছিলেন। পণ্ডিতেরা সকলে মিলে তাঁকে বিধান দিলেন, এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নেই, তপ্ত ঘৃত পান করে তুমি দেহ ত্যাগ কর। কিন্তু মহাপ্রভু সকল শুনে বললেন, শুধু শুধু আত্মঘাতী হবে কেন? তার চেয়ে

"যাহ তুমি বৃন্দাবন
নিরন্তর কর সেথা
কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন।
এক নামাভাসে তোমার পাপদোষ যাবে।
আর নাম লইতে কৃষ্ণচরণ পাইবে
আর কৃষ্ণ নাম লইতে কৃষ্ণ স্থানে স্থিতি
মহাপাতকের হয় এই প্রায়শ্চিত্তি।"

নামের এমন শক্তি। ভগবান তাঁর সর্ব্বশক্তি এমনই করে নামে দান করে গেছেন যে, নামাভাসেও মুক্তি হয়। ছেলের নাম নারায়ণ ছিল, মৃত্যুর সময় নারায়ণ, নারায়ণ বলে ছেলেকে ডেকেও মানুষ তাঁর পরম পদ পেয়েছে; অজামিলের কাহিনীতে শ্রীভাগবতে এমনও দৃষ্টান্ত আছে। এই নাম মাহাত্ম্যের জন্যই কলিযুগ সর্ব্বযুগ সার। মালায় সংখ্যা নাম জপ করাও রোমান ক্যাথলিক ইত্যাদি অনেক ধর্ম্মের মধ্যেই আছে, শুধু যে হিন্দুধর্ম্মে আছে তা নয়। আর এই বার্থ ডে সেলিব্রেশন বা জন্মদিন পালন এটাও সমস্ত জাতির ধর্ম্মের মধ্যেই রয়েছে! কিন্তু এই

জন্মদিন পালন যেন কেবল এই ভোগায়তন নশ্বর পাঞ্চভৌতিক দেহের জন্যই না হয়। কিন্তু এই দেহের অন্তরালে যে দেহী রয়েছেন বহু জন্মের তপস্যার ফলে দেবালয়রূপে আমরা এই যে মানব দেহ মানব জন্ম পেয়েছি এর সত্যকার লক্ষ্যের দিকে অধ্যাত্ম অভীপ্সার দিকে আমরা যেন যেতে পারি। আর আমার জীবনের সমস্ত কিছুই যেন মানব কল্যাণে বিশ্ব কল্যাণে উৎসর্গ করে দিতে পারি। আপনারা আমাকে এই যে এত ভালোবাসা এত শ্রদ্ধা দেখালেন সে আমার কোন গুণে নয়, সে আপনাদেরই গুণ। আপনাদের শুদ্ধ দিব্য অন্তরের প্রতিচ্ছায়ারূপে আমাকেও আপনারা এমন করে দেখছেন। আমার নিজের কিছুই এর মধ্যে নাই। আমি এই শুভদিনে আপনাদের সকলের, বাঙ্গলার সকলের ভারতের সকলের, জগতের সমস্ত বিশ্বচরাচরের একান্ত মঙ্গল ও কল্যাণ কামনা করি।”

মহারাজের ভাষণটির প্রতিলিপি মাত্র দিতে পারলাম কিন্তু তাঁর প্রত্যেকটি কথার মধুর উচ্চারণ ভঙ্গী, প্রতিটি কথাকে ঘিরে তাঁর সারাজীবনের সাধনালব্ধ যে অমোঘ শক্তির লীলা সে সবতো আর কিছু দেওয়া গেল না। আমরা ৮ই জানুয়ারি সকালের ট্রেণে বীরভূমে ফিরে যাব। রাত্রির কীর্ত্তন শেষে শ্রীশ্রীমহারাজের শ্রীচরণে প্রণাম করে বিদায় নিয়ে নিলাম। জানিনা আবার কবে তাঁকে দেখব। এই আশা হৃদয়ে বহন করে আবার জীবন যাত্রার নিত্য নৈমিত্তিকতায় যোগ দিলাম।

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

১৯৫২ ৯ই মার্চ্চ আমরা শ্রীশ্রীমহারুদ্র যজ্ঞের পূর্ণাহুতি দর্শনের জন্য দেওঘর আশ্রম যাত্রা করলাম। ডাক্তারের বাড়ী, যাওয়ার আগের দিন অবধি ঠিক ছিল না। যাওয়া সম্ভব হ'য়ে উঠবে কিনা! হাতে যদি শক্ত রোগী না থাকে তবেই যেতে পারবেন, সেই সঙ্গে আমারও যাওয়া হবে, নইলে নয়। আশায় আশঙ্কায় দিন গুণছিলাম। ১১ই মার্চ্চ পূর্ণাহুতি হ'য়ে যাবে। শেষ মুহূর্ত্তে যাওয়া ঠিক হ'লো। বেলা দশটায় যে গাড়ীটা এখান থেকে ছাড়ে সেইটে ধরে রওনা হ'লে অণ্ডালে. আসানসোলে এবং যশিডিতে গাড়ীবদল করে বেলা পাঁচটার মধ্যে আশ্রম পৌঁছাতে পারব। মহারাজকে যেখানেই দর্শন করি সেখানেই হৃদয় মন পূর্ণ হ'য়ে যায়। কোন বিশেষ স্থানে তাঁকে দেখব এ কামনা কখনও আমার মনে জাগেনি। কত বর্ণনা শুনেছি, পুরীতে সমুদ্রের কলগানের মাঝে তিনি বালুময় বেলাভূমির উপর দিয়ে অতিক্রুত চ'লেছেন, যেমন মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ অতি দ্রুত-গমনে যেতেন। মনে হয় না যে, মাটিতে শ্রীচরণ স্পর্শ করছে। শিলংয়ের পার্ব্বত্যময় বনশ্রীর মাঝে, রাঁচির পাহাড় ঘেরা ঝর্ণার ধারে, কত বিচিত্র দৃশ্যের মাঝে মহারাজ শিশুর মত প্রসন্নহাস্যে এক পাথর থেকে আর এক পাথরে লাফিয়ে চ'লেছেন। ঝর্ণার ধারে বনভোজন করেছেন! কিন্তু সেসব দেখবার কোন অত্যুগ্র আগ্রহ জাগেনি। মনে হয়েছে সর্ব্বদা

মহারাজই Supreme reality. আর সব তাঁরই আনুষঙ্গিক মাত্র। ক'লকাতার প্রবল জনস্রোতের মাঝে, বহু জনতার সঙ্গে দূরে ব'সে তাঁর কীর্ত্তন শুনেও যে গভীর আনন্দ পেয়েছি, পর্ব্বত মেখলা বা সমুদ্রের তরঙ্গোচ্ছ্বাস সে আনন্দ আর বেশি বাড়াবে কি? যা কিছু দৃশ্য সে তো তাঁকে ঘিরেই। তিনি যে মুহূর্ত্তে আসনে এসে ব'সেন, দর্শন দান করেন, সেই মুহূর্ত্তেই সারা পৃথিবীর তিনিই কেন্দ্র বিন্দু হ'য়ে যান, আর কোন কথা আর কোন দৃশ্য কিছুই মনে থাকে না। কিন্তু দেওঘর রামনিবাস ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে যাবার জন্য একটা আকুলতা সব সময়েই জেগে থাকে। ধ্রুবতারা বা শুকতারা দেখে আমরা যে সাধারণ তারা দেখার চেয়ে অনেক বেশি আনন্দ পাই তার কারণ রাত্রি শেষের আধো আলো আধো অন্ধকারের মাঝে ভোরের আকাশে শুকতারার ঐ পুণ্য দীপ্তি বা অবিচলিত অচপল ধ্রুবতারার স্থির উজ্জ্বলতা কত যুগ যুগান্ত ধরে কত নরনারী কত সাধকের হৃদয় মনপ্রাণ সিঞ্চিত করা ভক্তিশ্রদ্ধার অর্ঘ্য পেয়ে এসেছে। সেই সব সঞ্চিত ভাবের স্পর্শ যেন আমাদেরও মনে এসে লাগে। তেমনই দেওঘরের আশ্রম আমাদের গুরুস্থান। গুরুপরম্পরা ক্রমে এখানে আমাদের জন্যে কত সান্ত্বনা কত পরমাশ্রয় কত সাধনার কত কল্যাণের ধারা জমাট বেঁধে রয়েচে, এমন প্রাণ মন জুড়োবার জায়গা কোথায় গেলে আর পাব? মহারাজ আজকাল দেওঘর আশ্রমে খুব কম যান। জন্মোৎসব, গুরুপূর্ণিমা

প্রভৃতি প্রায় সব বড় বড় উৎসবগুলিই আজকাল আশ্রমের বাইরে ক'লকাতায় হয়। সারা বছরের অধিকাংশ সময় তাঁর ভারতের দেশ দেশান্তরে গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে হরিনাম বিতরণে কেটে যায়, আশ্রমে কদাচিৎ কখনো য'ান। আর তিনিই তো আশ্রম বিগ্রহ, তিনি না থাকলে আশ্রমে কে যাবে? কিন্তু এই মহারুদ্রযজ্ঞের সময় তাঁকে যজ্ঞ সমাপনের জন্য আশ্রমে যেতেই হয়। এবারে মহারুদ্রযজ্ঞের একাদশ বার্ষিকী বৎসর। শুনলাম এবার মহারাজ দু'টি মহারুদ্রযজ্ঞ একসঙ্গে করছেন, দু'টি যজ্ঞের একসঙ্গে আহুতি দিচ্ছেন। দেওঘরের শ্রীশ্রীরামনিবাস ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমটি শ্রীশ্রীবালানন্দ ব্রহ্মচারী রোড, করণীবাদ এর উপর অনেকখানি জায়গা জুড়ে। নানা লোক কল্যাণকর প্রতিষ্ঠান এই আশ্রমের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। আয়ুর্ব্বেদ কলেজ, চতুষ্পাঠী অবৈতনিক বিদ্যায়তন, চিকিৎসালয় ইত্যাদি। আশ্রমের ভিতরে ব্রহ্মচারী আশ্রম কর্ম্মী, সন্ন্যাসী এবং সাধকেরা ছাড়া স্ত্রীলোকদের রাত্রি বাসের নিয়ম নাই। আশ্রমের এলাকায় বাইরে আশ্রমের নিজস্ব বহু বাড়ী অতিথিশালা এবং ভক্তদেরও নানা বাড়ী আছে। মহারাজের শত সহস্র গৃহী ভক্ত নরনারী সকলেই যখন উৎসব উপলক্ষ্যে আশ্রমে আসেন। সেখানে আশ্রয় পান।

বাড়ীগুলি আশ্রমের হাতার বাইরেই, খুব কাছে। আর উৎসব উপলক্ষ্যে সমাগত এই হাজার হাজার ভক্তের খাওয়া দাওয়া সুখস্বাচ্ছন্দ্য সমস্ত ভারই আশ্রম গ্রহণ করেন।

আশ্রমের ভিতরে বিরাট রন্ধনশালা যজ্ঞের জন্য সমাগত হাজার হাজার ভক্তের সেবার জন্য সর্ব্বদা কর্ম্মরত। দিন রাত্রি দু'বেলাই সেখানে সকল প্রকার আহার্য্য তৈরী হচ্ছে। আর যজ্ঞের এই অমানুষিক পরিশ্রমের মধ্যেও মহারাজ দু'বেলা নিজে দাঁড়িয়ে ভক্তদের আহারের ব্যবস্থা দেখা, কখনো কখনো নিজে পরিবেষণ করা সমস্তই করছেন।

গত বছর মহারুদ্র যজ্ঞের দশম বার্ষিকী বৎসর ছিল, সেবার মহারাজ একটি যজ্ঞের আহুতি দিয়েছিলেন, এরকম দু'টি যজ্ঞ এক সঙ্গে করতে হয় নাই, পরিশ্রম এবছরকার চেয়ে একটু কম ছিল, তিনি নিজেই পূর্ণাহুতির দিন সন্ধ্যে থেকেই কীর্ত্তন আরম্ভ করেছিলেন। সে এক অপূর্ব্ব স্মৃতি! সেবার আমার ভাই শুভেন্দু, এখানকার কলেজের অধ্যাপক ছিল, আমারই কাছে থাকত। ছুটি নিয়ে মহারুদ্র যজ্ঞ উপলক্ষ্যে পূর্ণাহুতির ৬।৭ দিন আগেই দেওঘর গিয়েছিল। আমিও তার সঙ্গে গেছিলেম। আমরা বিকেল পাঁচটায় সেবার যখন আশ্রমে পৌঁছেচি, ঠিক সেই সময় হাতীর পিঠে বড় মহারাজ শ্রীশ্রীবালানন্দ ব্রহ্মচারীর বিরাট প্রতিকৃতিসহ এক বিশাল শোভাযাত্রা বাহির হ'য়েছে। কাঁসর ঘণ্টা নানা রমণীয় বাদ্যধ্বনির সঙ্গে নানা মাঙ্গলিক আয়োজন ও পুষ্পলাজ বর্ষণের মাঝে সেই পুণ্য শোভাযাত্রা ধীরে ধীরে নগর পরিভ্রমণ করতে যাত্রা করলেন। আমরা আশ্রমে ঢুকবার পথে গাড়ী থেকে নেমে কিছুকাল দর্শন করে দূরে থেকে প্রণাম করে আশ্রমে প্রবেশ করলাম।

রাস্তার সামনে আশ্রমের প্রধান তোরণ দিয়ে ঢুকলাম। কী রমণীয় দৃশ্য। চারিদিকে সবুজ তৃণাঙ্কিত ভূমি গাছপালা পুকুর, মাঝে মাঝে আশ্রমের এক একটি বাড়ী। কোনটি ব্রহ্মচারী সদন, কোনটি আয়ুর্ব্বেদিক ভবন, কোনটি চতুষ্পাঠি। একটু দূরে পুণ্যবতী চারুশীলামায়ীর প্রতিষ্ঠিত বিরাট যুগল মন্দির। যুগল মন্দিরের সামনেই নর্ম্মদা, একটি সুবিশাল সরোবর। তিন চারটি পাথরে বাঁধান ঘাট। এই নর্ম্মদা তীরেই মহারাজ অতি প্রত্যুষে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে এসে বসেন এবং প্রাতঃ সন্ধ্যার সমস্ত কৃত্য এখানেই করেন। আবার বিকেলে পাঁচটার থেকে এই নর্ম্মদা তীরেই কয়েকবার তাকে প্রদক্ষিণ করে পরিক্রমা করেন এবং সন্ধ্যা সমাগতা হলে এরই তীরে সায়ং সন্ধ্যা সমাপন করে নিজের ঘরে ফিরে যান। যজ্ঞের সময় শেষ দিকে তাঁর কাজের চাপ অসম্ভব বেড়ে যায় তখন আর নর্ম্মদাতীরে বিকেলে বেড়াবার সময় পান না। পাঁচটার সময় যখন আমরা পৌছালাম তখন তিনি যজ্ঞশালায় সায়ংকালীন আহুতি দানে রত। আমাদের বাসা দেওয়া হয়েছিল “বিশুদ্ধনিবাসে।” আশ্রমের হাতার বাইরেই বাড়ীটি। বিশুদ্ধ নিবাসের ছাদে উঠলে সমস্ত আশ্রমের দৃশ্যটি ছবির মত চোখে পড়ে। মহারাজের নিজের বাড়ীটি তো বিশুদ্ধ নিবাসের এত কাছে যে ছাদ থেকে সমস্ত বাড়ীটি আগাগোড়া দেখা যায়। আশ্রমের এত কাছে থাকতে পেয়ে আমাদের খুবই আনন্দ হ'লো। স্নান করে মহারাজের দর্শনের

জন্য আমরা যজ্ঞশালা অভিমুখে গেলাম। যজ্ঞশালা বিরাট একটী কক্ষ, সেই কক্ষের চারিদিকে প্রকাণ্ড দরজা, সমস্ত দ্বার খোলা। কক্ষের মধ্যভাগে সুবিস্তৃত যজ্ঞকুণ্ড। কক্ষের ভিতর দর্শকদের বা অপর কাহাকেও প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। ঘরটির চারিদিক ঘিরে সুবৃহৎ বারান্দা। সেখানেই সমবেত ভক্তেরা দর্শনের জন্য বসেছিলেন। যজ্ঞশালায় একদিকে পঞ্চানন, যজ্ঞেশ্বর আশুতোষ মূর্ত্তি, একদিকে শক্তির বেদী এবং ঘটস্থাপনা আর যজ্ঞকুণ্ডের সামনে যে বেদীর উপর বসে মহারাজ আহুতি প্রদান করেন ঠিক তার মুখোমুখি আর একটি সু-উচ্চ বেদীর উপর শ্রীশ্রীবালানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের সুবৃহৎ একটী প্রতিমূর্ত্তি পুষ্পদামে সুশোভিত করে স্থাপিত হয়েছে। দুজনে যেন ঠিক মুখোমুখি ব'সে পরস্পরের মাঝে তন্ময় হয়ে রয়েচেন। আমরা যখন পৌছালাম তখন অত বিরাট যজ্ঞমণ্ডপে কোথাও তিল-ধারণের জায়গা নেই। পাশের মন্দির গুলির চত্বর, অলিন্দ, প্রাঙ্গণ সব দর্শনার্থী সহস্র সহস্র নরনারী পূর্ণ। এমন কি গাছের ডালে চড়েও অনেকে দেখচেন। মহারাজের কি প্রবল আকর্ষণ! বন্যার স্রোতের মত যেদিকে চাই কেবল মানুষ। কেবল মানুষ! এত লোক হয়েছিল যে ইয়ত্তা করা দুষ্কর। ওরই মধ্যে সকলেই স্নেহ করে দয়া করে একটু জায়গা দিলেন সেখানে থেকে মহারাজের দর্শন হয়। কতদিন পর তাঁকে দেখছি। অগ্নির লেলিহান শিখায় প্রজ্জলিত হয়ে র'য়েচে সমস্ত স্থান। স্ফুলিঙ্গ উড়ে পড়ছে চারিদিকে।' মহারাজ

সেই অগ্নিসায়রের মাঝে জ্যোতির্ম্ময় প্রশান্ত মূর্ত্তিতে উপবিষ্ট হয়ে আহুতি দিচ্ছেন ঃ—

"ওঁ নমঃ শিবায চ শিবতরায চ
ওঁ নমঃ স্বাহা।
ওঁ নমঃ নীলায় চ নীলকণ্ঠায় চ
ওঁ নমঃ স্বাহা
ওঁ নমঃ—সৌম্যায চ পশুনাং পতয়ে চ
ওঁ নমঃ স্বাহা

আহুতি প্রদান শেষ হ'লে মহারাজ আরত্রিক করলেন। পঞ্চপ্রদীপ হাতে নিয়ে তিনি যখন উঠে দাঁড়ালেন এবং ঘুরে ঘুরে আরতি করতে থাকলেন একবার যজ্ঞঅগ্নিকে একবার যজ্ঞেশ্বরকে একবার শক্তিরূপা অধিষ্ঠাত্রীর ঘটকে একবার শ্রীশ্রীবালানন্দ মহারাজকে ; তখন অপার্থিব এক দৃশ্য হয়েছিল। স্পষ্টই মনে হচ্ছিল তিনি অন্য এক লোকে উঠে গিয়েছিলেন। আরতির সময় ঠিক ছন্দের তালে মহারাজার শ্রীচরণ দুখানি নৃত্যের ভঙ্গীতে একটু একটু তাল দিচ্ছিল। সকল সময় লক্ষ্য করে দেখেচি—মহারাজ তালে তালে সব কাজ করেন। এই যে আরতি করচেন, এরও একটী ছন্দ লয় তাল আছে, সেই তালের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তাঁর শ্রীচরণ দুখানি আবর্ত্তিত হচ্ছে। বিধাতার সমস্ত কাজই তালে। এই নক্ষত্র জগত অগণ্য সৌরমণ্ডলী কোটী ছায়াপথ কোন অদৃশ্য নুপূরের তালে তালে আবর্ত্তিত হ'য়ে চলেছে। সেই নুপূরধ্বনি একদিকে যেমন

পরম রমণীয় সুকুমার রসঘন আর একদিকে তেমনই বজ্র সুকঠিন শাসনের ছন্দে কঠোর। অগ্নিদীপ্তিতে প্রভাময় ভাস্বর।

যজ্ঞের সময় মহারাজের শ্রীমূর্ত্তির সঙ্গে যেন তার মিল আছে। একটু আগে তিনি যখন অগ্নিতে আহুতি দিচ্ছিলেন তখন অগ্নিপ্রভায় সমুজ্জ্বল তপস্যাকৃশ সেই অতি প্রিয় শ্রীমূর্ত্তির দিকে অনিমেষে চেয়েছিলাম।

আবার আহুতি শেষ করে যখন তাঁর কুসুম সুকুমার কোমল করে কখনও ফুল কখনও প্রদীপ কখনও গন্ধবারি কখনও চামর নিয়ে তিনি আরতি আরম্ভ করলেন তখন তাঁর সেই সেবারত মূর্ত্তিতে আরও কিসের আভা যেন এসে পড়ল। উমার তপস্যা শেষে সেই রমণীয় ললাট ফলকে স্মিত বিকশিত সলজ্জ হাস্যের আভা ফুটে উঠেচে। শীত রিক্ত হিম ঋতুর অবসানে নবকিশলয় মর্ম্মরিত হ'য়ে উঠেচে।

আমার বোন বেলা ভাগলপুর থেকে এসেছিল। সে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে বললে, যজ্ঞের সময় মহারাজকে দেখা, এর আর তুলনা হয়না। বাবাকে কতবার বলেছি তুমি এসুযোগ ছেড়োনা, একবার এসে দেখে যেও। কীরকম মনে হয় বলতো? যখন আহুতি দেন আর আগুন উর্দ্ধশিখা হ'য়ে জ্বলে। মনে হয় তাঁকে কখনও ব্রহ্মার মূর্ত্তি কখনও শিবের মূর্ত্তি কখনও নারায়ণ মূর্ত্তি! কীরকম একটা অপার্থিব জিনিষ। তোমার কীরকম মনে হয়।

আমি বললাম, যজ্ঞ খুব ভালো জিনিষ, বিশ্বকল্যাণের জন্যে করছেন। কিন্তু এসমস্তই মহারাজকে নূতন করে একটু বিচিত্ররূপে ফুটিয়ে তুলবার পটভূমিকারূপেই আমার মনে হয়।

তিনিই Supreme reality, তিনিই চরম সত্য। নানা আলো এসে তাঁর উপর পড়লে কেমন বৈচিত্রী হয় সেইটে দেখবার একটু আকাঙ্খা। তাছাড়া আর কি! আর ব্রহ্মা বিষ্ণু নারায়ণকে তো কখনও দেখিনি, তাঁরা কি মহারাজের চেয়েও সুন্দর? যাঁকে প্রাণভরে ধ্যানের পত্রপুট ভরে সকল সময়ে দেখতে ইচ্ছা করে দর্শনের আশ মেটেনা তাঁকে ছেড়ে নারায়ণ মূর্ত্তি বা শিবমূর্ত্তি এসব কল্পনা করতে ইচ্ছাও করে না। প্রত্যক্ষ ছেড়ে অপ্রত্যক্ষে যাব কেন? সত্য ছেড়ে অনুমানে যাবার দরকার। কিন্তু ভাই যার যেরকম ভাব। ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন।

তিনি সকলের সকল ভাব অতি আদরে নিজের হাতে তুলে নে'ন। তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করলে তাই আমার পক্ষে যা সত্য মনে হয় তা-ই বললাম।

অনন্ত ভাবময় তিনি অনন্তভাব ভালোবাসেন, যার যেটি ভাব আন্তরিক ব্যাকুলতার সঙ্গে তাঁকে নিবেদন করে দিলে দু'হাত বাড়িয়ে সেইটি তিনি তুলে নেবেন। তবে মনে হয়, দেবতার চেয়ে নর-দেবতা আরও বড়। "কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নর-লীলা, নরবপু তাহার স্বরূপ।" শ্রীচৈতন্য

চরিতামৃতের এই কথাটী মন্ত্রের মত মনে হয়। কিছুতেই ভুলতে পারি না। শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বলেছেন "এই নির্গুণ পর ব্রহ্মাই আবার সাকার হয়ে লীলা করছেন। কাক ভুশুণ্ডীর পর্য্যন্ত সংশয় জন্মেছিল। তিনিই কি এই দশরথ তনয় শ্রীরামচন্দ্র? তিনিই কি এই অযোধ্যায় দশরথের ঘরে? তা কি সম্ভব? একদিন শ্রীরামচন্দ্র আঙ্গিনায় হাতে করে খাবার খাচ্ছেন; কণিকা মাটিতে পড়ছে আবার তা কুড়িয়ে নিচ্ছেন। কাক ভুশুণ্ডী দাঁড়িয়ে দেখচেন আর ভাবছেন এই কথা, এমন সময় তাঁকে দেখে শ্রীরামচন্দ্র একটু হেসে ধরবার জন্য শ্রীহস্ত বাড়ালেন, ভুশুণ্ডী ভয়ে পালালেন। কিন্তু হাত তাঁর পেছনে পেছনে চলল। কাক ভুশুণ্ডী সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ঘুরতে লাগলেন, শ্রীহস্ত তাঁর পেছনে পেছনে। অবশেষে আর কোথাও স্থান না পেয়ে পুনরায় দশরথের আঙ্গিনার সেই স্থানেই এসে উপস্থিত হ'লেন। তাঁকে দেখে রামচন্দ্র আবার একটু হাসলেন। তখন ভুশুণ্ডী শ্রীরামচন্দ্রের মুখের ভিতর প্রবেশ করলেন। দেখলেন—অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, লোক-লোকান্তর চতুর্দ্দশ ভুবন সমস্ত রামচন্দ্রের শ্রীমুখের ভিতর বর্ত্তমান। কত ব্রহ্মাণ্ডে এইরূপ কত শত রামলীলা করছেন। নিজেকেও ভুশুণ্ডী ঐরূপ একস্থানে দেখলেন। দেখে তিনি তো অবাক..." আমার এই কাক ভুশুণ্ডীর ঐ অবাক ভাবটি খুব মনে লেগেছিল। পুরীতে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের মন্দিরে হিন্দু'দের যত দেব-দেবী, তাঁদের মনে যতরকম

উপাসনার ভাব জেগেছে সকল বিগ্রহেরই প্রায় মূর্ত্তি র'য়েছে, এই কাক ভুশুণ্ডীরও একটি মূর্ত্তি আছে, আগ্রহ করে দেখে এসেছিলাম। যিনি নরদেবতা তিনি আমাদের মহারাজের মত সকল ভাবের ভাবুক। দীনের অতি তুচ্ছ ভাবতরঙ্গটুকুও তাঁকে স্পর্শ করে। মহাপুরুষেরা প্রথমে সাধনা ক'রে খুব বড় হ'ন তারপরে আমাদের প্রতি অহেতুক অপরিসীম করুণায় গলে যেয়ে তাঁরা আবার খুব ছোটটি হ'য়ে আমরা প্রত্যেকে তাঁকে যাতে ধরতে ছুঁতে পারি এমনই করে আমাদের মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দে'ন।

মহারাজকে একদিন সত্যনারায়ণ পূজার পরে পাঁচালিতে কথা পড়তে শুনেছিলাম। এত অবাক লেগেছিল। ভাবতে পারো যিনি এমন একটা অবস্থায় আছেন যে, কীর্ত্তনের সময় মহারাজের কমলসম অরুণ আঁখিযুগলের দিকে স্তব্ধ হয়ে চেয়ে ভাবি, একটা মহাসমুদ্রের বিপুল উদ্দাম তরঙ্গের উচ্ছ্বাসকে তিনি অঙ্গুলি হেলনে ঠেকিয়ে রেখেচেন কেবল এই জন্যে যে, তিনি যদি ভেসে যান কীর্ত্তনের রস এবং নামের অমৃত আমাদের দান করবেন কেমন করে? সেই তিনি প্রতি পূর্ণিমায়, প্রতি সংক্রান্তিতে ভক্ত গৃহস্থের গৃহ প্রবেশের আহ্বানে সত্যনারায়ণ পাঁচালি পড়ছেন:—

"কলাবতী নামে কন্যারূপে অনুপমা"..

কিন্তু তারপরেই মনে হোল, মহারাজের মত মহাশক্তিধর যিনি, দেবমানব যিনি, তিনিই তো তা পারবেন। শুধু দেবতার

শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ পূজারত শ্রীশ্রীমহারাজ।

এত সাধ্য ছিল না। তিনি যে দেব-মানব। বাংলার ঘরে ঘরে একটু মাটির প্রদীপের আলো, সামান্য কয়েকটি বাতাসা পাঁচালি দিয়ে রচা সহজ সরল ছন্দে ভাষায় ভগবানের নাম গান····· মহারাজ তাতেই আবার নূতন করে প্রাণ সঞ্চার করছেন। শক্তি সঞ্চার করছেন। যাতে আবার জেগে উঠতে পারে এমনই অনাড়ম্বর সহজ সরল প্রাণে বাংলার পল্লীতে ঘরে ঘরে তাঁকে ডাকবার আরাধনা। যেটি প্রায় লুপ্ত হতে বসেছে। যজ্ঞের কয়েকদিন 'বিশুদ্ধ নিবাসের' একটি ঘরে আমরা ভাই, বোন, মা, বাবা, সকলেই একসঙ্গে থাকতাম। লোক লোকারণ্য, একটি ঘরের বেশি আমাদের পক্ষে পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু তাতেই আমাদের আনন্দ আরও কূল ছাপিয়ে গেছিল। সারাদিন নানা বিচিত্র কর্ম্মে এবং আরাধনায় রত মহারাজের শ্রীমূর্ত্তি দর্শন আর বিশ্রামের অবকাশে তাঁর কথা আলোচনা। মহারাজের গল্প করতে করতে রাত্রি শেষ হ'য়ে আসত। ভোর পাঁচটায় উঠে আমরা নর্ম্মদার তীরে যেতাম। অন্য অন্য স্থানে (কাশী ছাড়া, শুনেছি কাশীতেও নাকি তিনি গঙ্গাতীরেই প্রাতঃসন্ধ্যা। হোম ইত্যাদি বাইরেই করেন, ভক্তেরা এবং দর্শকেরা ইচ্ছা করলে তা দর্শন করতে পারেন।) যে সমস্ত কৃত্যগুলি মহারাজ ঘরের মধ্যে দ্বার রুদ্ধ করে করে থাকেন, আশ্রমে তা বাইরেই করেন। অন্ধকার থাকতে শেষ রাত্রিতে তিনি নর্ম্মদার তীরে উপবেশন করে প্রাতঃসন্ধ্যা গীতা চণ্ডীপাঠ ইত্যাদি

তাঁর যা কিছু নিত্যক্রিয়া করতে বসেন। আমরা অনেকটা দূরে বসে তাঁর শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করি। মহারাজের সঙ্গে একটি ছোট ব্যাগে তাঁর সন্ধ্যার সরঞ্জাম গুলি ও নিত্য পাঠ্য শাস্ত্রগ্রন্থ গুলি থাকে, কোন সেবক সেটি সঙ্গে করে নিয়ে আসেন, আর মহারাজের হাতে থাকে বড় একটি টর্চ্চ। তার থেকেই অনুমান হয় ভোরের আলো ফুটবার আগে অন্ধকার যখন ও মিলায় না তখনই তিনি আসেন। সমস্ত হ'য়ে গেলে তিনি নর্ম্মদা তীর থেকে উঠে নিজের ঘরের দিকে যান। দূরে থেকে আমরা প্রণাম করি। কারণ অত সকালে তো স্নান করে আসিনি। এরপর তিনি যজ্ঞমন্দিরে যেয়ে পূজার স্থানে বসেন। সেখানে নিজ হাতে মহারুদ্র, শক্তি, বিষ্ণু সকলের অভিষেক, স্নান, পূজা, ভোগ আরতি সমাপন করে শ্রীশ্রীবালেশ্বরী মন্দিরের চত্বরে বসে নিত্য হোমের যে অনুষ্ঠানটি অন্যত্র ভক্ত শিষ্যের বাড়ীতে অধিষ্ঠান কালে আপন কক্ষে দ্বার নিরুদ্ধ করে সমাপন করেন সেই প্রতি-দিনের হোমটি সেখানেই করেন। সমাগত শিষ্য ভক্ত সকলেই দর্শন করেন সেখানে বসে। হোমের পর যেদিন দীক্ষা থাকে সেদিন দীক্ষা দান করেন। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভুর মতন অহৈতুকী করুণা ঘনবিগ্রহ মহারাজ যে চায়,চাওয়ামাত্র বিনা প্রশ্নে বিনা দ্বিধায় তাকে নামদান এবং দীক্ষা দান করেন। অবিরাম স্রোতে তাঁর এই করুণার ধারা বয়ে চলেছে। শুধু যে দেওঘরের আশ্রয়ে তাঁর গুরুপীঠে এই দীক্ষা কার্য্য সমাধা করেন তা নয়। অনেকের আগ্রহে যেখানে যখন যার সুবিধে সেইখানেই তাকে

দীক্ষা দেন। আঠারো বাড়ীতে কলকাতায় একদিন একসঙ্গে তেতাল্লিশ জনকে দীক্ষা দিয়েছিলেন। মহারাজকে বাইরে থেকে দেখে তাঁর চম্পক অঙ্গুলিতে ভক্তপ্রদত্ত রত্নখচিত অঙ্গুরীয় ও মহার্ঘ্য পট্ট বাসের দিকে অনেকের আগে দৃষ্টি পড়ে। ক'লকাতার কীর্ত্তন সভার প্রাসাদোপম বাড়ী, চোখ ঝলসানো তড়িতালোক আর ফুলের মালার অজস্রতা দেখে অনেকে ভাবেন এ কী! কিন্তু এই ফুলের মালা আর দীপের আলোর অন্তরালে যে আত্মদানের আহুতি চলেছে সেখানে কি আমাদের দৃষ্টি পৌঁছায়? যদি পৌঁছাত তাহলে আমরা দিব্য নেত্রে দেখতে পেতাম সেখানে সেই একই জিনিষের পুনরাবৃত্তি হচ্ছে: ভগবানের অহেতুকী করুণায় নেমে এসে বেদনার শতদলের মাঝে নিজেকে আহুতি দেওয়া। সেখানে সেই একই ছবি: চণ্ডালের দত্ত মাংস গ্রহণ করে বুদ্ধদেব অন্তিম মুহূর্ত্তেও বাহু অবলম্বন করে কম্বল শয্যা থেকে কোনক্রমে উঠে বসেছেন শেষবারের মত আর্ত্ত, জিজ্ঞাসুকে উপদেশ দিতে।

খ্রীষ্ট তিনি নিজেই নিজের ক্রুশবিদ্ধ হবার ভারি কাঠখানা পিঠে বহন করে হামাগুড়ি দিয়ে বধ্য ভূমিতে চ'লেছেন।

ত্রিলোকে যাঁর কোন কর্ম্ম কোন প্রয়োজন নেই, সেই শ্রীকৃষ্ণ প্রচণ্ড কর্ম্ম অবসানে ব্যাধের বিষাক্ত শরে আহত হয়ে বৃক্ষকাণ্ডে হেলান দিয়ে অন্তিম মুহূর্ত্তের অপেক্ষা করছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ অসহনীয় দুরন্ত ক্যানসারে আক্রান্ত হয়েও আনন্দের হাট তেমনই পূর্ণ রেখে বলছেন :

"এসে পড়েছি যে দায়
সে দায় বলবো কায়।
যার দায় সে আপনি জানে
পরে কি জানে পরের দায় ?"

মহারাজ এই যজ্ঞের কয়েকদিনে যেন আরও জ্যোতির্ম্ময় হয়েছেন। কিন্তু তাঁর অতি কৃশ দেবতনু অধিকতর কৃশ হয়ে গেছে। অসম্ভব পরিশ্রম, তার উপর যজ্ঞের এই পনেরদিন রাত্রির দিকে হয়তো সামান্য একটু হর্লিক্স বা দুধ ছাড়া আর কিছু নিবেদন করে গ্রহণ করেন না। যজ্ঞের পূর্ণাহুতি সমাধা না হওয়া অবধি এছাড়া আর কিছু গ্রহণ করেন না।

মহারাজের আহার্য্য এত সামান্য যে, এত কম আহারীয় বস্তু গ্রহণ করে কি ভাবে তিনি এত অক্লান্ত পরিশ্রম করেন কি করে প্রতিদিন নিয়মিত সাত আট ঘণ্টা করে সঙ্কীর্ত্তন করেন তার কিছুই বুঝে উঠতে পারা যায় না। অজিত মহারাজের নিত্যসঙ্গী। সে কীর্ত্তনের সঙ্গে হার্ম্মোনিয়াম বাজায়,এই কয়েক বছর মহারাজ যখন যেখানে গেছেন সে সঙ্গে গেছে। ভাগলপুর থেকে আসবার সময় ট্রেণে তার সঙ্গে কথা হচ্ছিল। অজিত বলছিল, মহারাজ যে কি খান তা দেবতারাও জানে না। সামান্য একটু দুধ নেওয়া ছাড়া তিনি আর কিছুই নেন না। অথচ এতু কম খেয়ে মহারাজের মত এত খাটতেও তো কাউকে দেখিনি। শুধু দরজা বন্ধ করে ধ্যান ধারণা তো তিনি করেন

না। নাম গান করে সারা ভারতবর্ষ তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন। রোজ সাত আট ঘণ্টা করে গান করা আর হেঁটে যখন বেড়াচ্ছেন তখন কার সাধ্য তাঁর সঙ্গে চলে। যেন উড়ে চলেছেন। কামাখ্যার পাহাড়ে মহারাজের সঙ্গে কেউ অত দ্রুত উঠতে পারলেনা। পুরীর সমুদ্রের ধারে বালির উপর দিয়ে বিদ্যুতের মত চলে যাচ্ছেন। রাঁচির ঝর্ণার ধারে এক পাথর থেকে আর এক পাথরে উল্কার মত বেগে লাফিয়ে চলেছেন। রোজ সারাদিন মাত্র দেড় পোয়া কি আধসের দুধ খেয়ে এত শক্তি আসে কোথা থেকে? Medical Science তার সমস্ত গবেষণা এবং জ্ঞান নিয়ে কিছুই বলতে পারবে না। শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বলেছিলেন: "ভক্তিতে করে মানুষের এই শরীরেই একরকম সুধা সৃষ্টি হয়। ব্রহ্মতালু থেকে তা চুইয়ে মুখে পড়ে। যাঁরা পরাভক্তিতে ভগবানের সঙ্গে সংযুক্ত, এই সুধাপান করে বাইরের আহারীয় আর তাঁদের ততটা প্রয়োজন থাকেনা।" "Divine life in a divine body" প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে তাঁর এক শিষ্যের কথোপকথন হয়।

Disciple: "Is food absolutely necessary for the body?"

Sri Aurobindo: "What is necessary for life is not food but vital force; there is an inexhaustible store of vital force in the universe, and one can draw any amount of it directly from the universe."

Disciple : "Is it not more difficult to take vital force directly from the universal energy than to take it through some kind of food ?"

Sri Aurobindo : "For me, the former is easier. I can draw as much vital force from the universe as I require. In jail I fasted for ten days—I slept on every third night, I felt no weakness, I had not lost my balance in the least I drew sufficient vital force from the universal energy to keep my strength intact, but I lost eleven pounds in weights. This waste of the purely material substance of the body could not be prevented, hence the necessity of taking some material food."

"দিব্যদেহে দিব্য জীবন" প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের সহিত তাঁর এক শিষ্যের কথবার্তা হয়। শিষ্য প্রশ্ন করেন ঃ "শরীরের জন্য আহারীয় বস্তু কি গ্রহণ করিতেই হবে ?"

শ্রীঅরবিন্দ বলেন ঃ শরীরের সকল সময় আহারের প্রয়োজন হয় না। কারণ শরীর ধারণের জন্য আহারের দরকার ঠিক নাই দরকার প্রাণশক্তির। আমাদের চারিদিকে এই বিশ্বপ্রকৃতিতে এই প্রাণশক্তির অফুরন্ত উৎস রয়েচে। সাধকেরা তাঁদের সাধনা দ্বারা আহারের থেকে প্রাণশক্তি না নিয়েও সোজাসুজি প্রকৃতির এই নির্ঝর থেকেই প্রাণশক্তি

আহরণ করতে সক্ষম। তাঁদের পক্ষে এই প্রণালীতে প্রাণশক্তি গ্রহণ করা আরও সহজ। আমার নিজের, আহার্য্য বস্তু থেকে প্রাণশক্তি সঞ্চয় করার চেয়ে এই উপায়ে প্রাণশক্তি গ্রহণ করা আরও সহজ বোধ হয়। বোমার মামলায় আমি যখন আলীপুর জেলে ছিলাম তখন দশদিন একাদিক্রমে উপবাস করে থাকতাম। তিনদিন অন্তর নিদ্রা উপভোগ করতাম। কিন্তু আমার বিন্দুমাত্র দুর্ব্বল বোধ হয় নাই। বরঞ্চ উপবাসেব আগে যে ভারী জিনিষ আমি উত্তোলন করতে পারতাম না, উপবাসের পর অনায়াসে সেই ভার উত্তোলন করেছি। হেঁটে বেড়িয়েছি দূরদূরান্তে, মস্তিষ্কের অসাধারণ পরিশ্রমে লেখাপড়ার কাজ করেছি, যোগসাধনা করেছি। আহার গ্রহণ না করার জন্য আমার এসকল কাজে কোন বাধা হয় নাই। বরঞ্চ আহার গ্রহণ না করে আমি আরও সতেজ ও সবল বোধ করতাম। কিন্তু আমার ওজন এগার পাউণ্ড কমে গেছিল। উপবাসের ফলে শরীরের অস্থি, মজ্জা, মাংসের এই শুষ্কতা বা পরিক্ষীণতা এটি রোধ করতে তখন পারিনি। সেজন্য এটি বজায় রাখবার জন্য অতি সামান্য কিছু আহারীয় বস্তু গ্রহণ করতে হবে।" মহারাজও আরও ক্ষীণ হয়ে গেছেন, তাঁর অস্থিসার শ্রীঅঙ্গ আরও অস্থিময় হয়ে গেছে, কিন্তু এক দিব্য জ্যোতি তাঁর তনু ঘিরে রয়েছে। হোম শেষ হয়ে গেলে তিনি নিজের ঘরের বারান্দায় তাঁর জন্য সজ্জিত আসনে এ'সে বসেন। এইখানে প্রণাম হয়। এই প্রণাম একটি অনেক

সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। যত লোক যত দর্শনার্থী যত ভক্ত এসেছেন সকলে দিনের মধ্যে একবার অন্ততঃ মহারাজকে প্রণাম করবেনই। সকলে সারি দিয়ে বসেন। একে একে তাঁকে প্রণাম করে তাঁর গলে বা তাঁর শ্রীচরণে মালা বা পুষ্প দিয়ে তাঁর হাত থেকে প্রত্যেকে প্রসাদ গ্রহণ করেন। এতে আড়াই ঘণ্টা তিন ঘণ্টা সময় লাগে। মহারাজ প্রসন্ন হাসিমুখে শেষ জনটিকে পর্য্যন্ত নিজের হাতে প্রসাদ দিয়ে তারপর উঠে যজ্ঞশালায় যান আহুতি দিতে মধ্যাহ্নকালীন। আহুতি দেওয়া শেষ করে অতিথিশালায় সমাগত ভক্ত এবং অতিথিদের আহার দেখতে যান। প্রত্যেককে সন্দেশ কিংবা পরমান্ন কিছু একটা নিজের হাতে পরিবেশন করেন। যজ্ঞের সময় বিকেলে আর নর্ম্মদাতীরে বেড়াবার সময় পান না, আবার সায়ংকালীন আহুতি, আরত্রিক, বেদপাঠ প্রভৃতি করতে তাঁকে যজ্ঞশালায় যেতে হয়। সন্ধ্যার সমস্ত করণীয় কৃত্য শেষ হয়ে গেলে, মহারাজ আশ্রমের সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, তাঁর গুরু ভ্রাতৃবর্গ এবং ভক্তমণ্ডলী সকলে সমবেত হ'য়ে তিনবার যজ্ঞশালা প্রদক্ষিণ করেন বেদমন্ত্র, বেদগান করতে করতে।

১৯৫১ শালে মহারুদ্র যজ্ঞের দশম বার্ষিকী বৎসরে মহারাজ নিজেই সমস্ত করেছিলেন। এমন কি পূর্ণাহুতির দিন অত কাজ অত অনুষ্ঠান সমস্ত শেষ হয়ে যাবা মাত্র সন্ধ্যায় আবার তিনি নিত্যদিনের মত কীর্ত্তন আরম্ভ করেন। সেইদিনের স্মৃতিটি এত উজ্জ্বল এত মধুর! গৌর পূর্ণিমা, আশ্রমের তরুলতা,

মন্দির সরোবর সমস্ত আকুল জ্যোৎস্নায় ভাসছে। হরিমণ্ডপে কীর্ত্তনের আসরে মহারাজের আসন সামনে রেখে কীর্ত্তন আরম্ভ হয়েছে। আমরা বসে শুনছি আর ভাবছি আজ কি মহারাজ এত ক্লান্তির পর কীর্ত্তন সভায় তিনি আসবেন? আজ তাঁর শূন্য আসনের সামনে বসে তাঁরই স্মৃতি ধ্যান করতে করতে আমরা কীর্ত্তন শুনব, মনে মনে তাঁকে প্রণাম করে শূন্য মনে ফিরে যাব। হঠাৎ দেখি কখন তিনি এসেছেন। যাঁর জন্য, যে পুরুষোত্তমের জন্য জ্যোৎস্না প্লাবিত আর্ত্তধরণী নাথহীন হয়ে প্রতীক্ষারতা ছিল, সহসা তিনি আবির্ভূত হলেন। সেই গৌরাঙ্গ কত যুগ পরে এসে নিজেকেই যেন নিজে আহ্বান করছেন। আমাদের গৌর পূর্ণিমা আজ পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো। মহারাজ করতাল শ্রীহস্তে নিয়ে ভাবনিমীলিত নয়নে গাইলেনঃ

"এস গৌরাঙ্গ, এস গৌরাঙ্গ এস গৌরাঙ্গ চাঁদ হে।......

......ওহে কীর্ত্তনীয়ার চূড়ামণি,

দয়া করে তোমায় আসতে হবে

তুমি নাএলে কীর্ত্তন সাজে না হে,

পাষাণ হৃদয় গলেনা হে।

আমি হৃদয় পাতিয়া দিব দোলায়

হৃদয়ে নাচিবে গৌর রায়

নাচ হে নাচ; নাচিবে বিশ্বনট-বিহারী রঞ্জন।......"

কিন্তু এবারে ১৯৫২ মহারুদ্রযজ্ঞের একাদশবার্ষিকী বৎসরে একেবারে শেষের দিকেই এসেছিলাম, এসে মহারাজকে

অন্যভাবে দেখলাম। তিনি এত অন্তর্মুখী অবস্থায় রয়েছেন বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে যোগ খুব কম। খুব একটা ভাবের মধ্যে রয়েচেন, অনেক কষ্টে মনের খানিকটা যেন বাহ্যজগতে ফেলে রখেচেন। অন্যবার পূর্ণাহুতির দিনে মহারাজ নিজেই সত্যনারায়ণ পূজা করেন, পাঁচালি পড়েন। কীর্ত্তন ও সেইদিন থেকে দুবেলা করেন কিন্তু এবার দেখছি তিনি কীর্ত্তন গাইতে পারছেন না। পূজা এবার পুরোহিত করলেন। কীর্ত্তনের সভায় শেষ দিকে এসে তাঁর শূন্য আসনে মহারাজ ব'সেন। মুদিত নেত্রে ভক্তদের গানের সঙ্গে খঞ্জনী বাজান। নিজে গাইতে পারেন না।

অজিত আমাদেরই ভাগলপুরের ছেলে। সে মহারাজের কীর্ত্তনের সবচেয়ে বড় সহায়ক। সেজন্য খুব গর্ব্ব বোধ করি। সে সদা সর্ব্বদা মহারাজের গানের সঙ্গে আগাগোড়া প্রথম হতে শেষ অবধি গায়। কীর্ত্তন সভার পৃষ্ঠ রক্ষা করবার যা কিছু ভার সব তার। আর সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হবার প্রথম থেকে শেষ অবধি তাঁর সুরের এবং ভাবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অজিতই বাজনা বাজায়। এবার দেখলাম তার মধ্যে মহারাজ খুব একটা শক্তি সঞ্চার করেছেন, গানের ভিতর দিয়ে সে তাঁরই ভাব অনেকটা দিতে পারছে। অজিত বলছেঃ "মহারাজ এবার গাইতে পারছেন না, বড্ড পরিশ্রম গেছে, গলা ভেঙ্গে গেছে।" যদি অজিতদের মত করে ভাবতে পারতাম! ওরা কত ভাগ্যবান! ভগবানের উপর একান্ত মমতা বুদ্ধি! আমি কিন্তু

কিছুতেই ওদের মত করে ভাবতে পারছিনে। মহারাজের এই অন্তর্লীন অবস্থা অবাক বিস্ময়ে শুধু চেয়ে দেখচি। কীর্ত্তনের আসরে তিনি কেবল চুপ করে ব'সে মুদিত নেত্রে খঞ্জনীতে আঘাত করছেন। তাও হাত যেন চলছেনা এমন…কিন্তু তবু সেই কী অপূর্ব্ব মোহন অনুভূতি! একটা পরম দিব্য সত্তায় আকাশ বাতাস পূর্ণ হয়ে আছে। অষ্টসাত্তিক বিকারের একটি হলো স্বরভঙ্গ। পরিশ্রমে তাঁর গলা ভেঙ্গেছে, কিছুতেই মনে হয় না। শুনেছিলাম কিছুদিন আগে শ্রীবৃন্দাবনে মহারাজ গেছিলেন। তখন শ্রীবৃন্দাবনে তিনি কীর্ত্তন করতেন না। সেখানে যে সেই একজনের কীর্ত্তন বাঁশরীর স্বরে নিত্যকাল থেকে ধ্বনিত হচ্ছে। এই আশ্রম মহারাজের শ্রীগুরু পীঠ এখানেও যে ঘনীভূত শ্রীবৃন্দাবন…কোন নূতন দিব্য অনুভূতির স্পর্শে কি তিনি নীরব হয়ে তাতেই মগ্ন আছেন? সে গানের সে সুরের রেশ ভঙ্গ করে নিজে আর গাইছেন না। কিংবা ভক্তের বিরহ সুধা সমুদ্র কি তাঁকে আপনাতে আপনি মগ্ন রেখেচে? শ্রীশ্রীবালানন্দ মহারাজ যাঁকে শুক্ল সন্ন্যাসী বলতেন, সেই ভক্তরাজ প্রাণগোপাল মুখোপাধ্যায়, সমস্ত আশ্রমের যিনি প্রহরী স্বরূপ নিত্য মুক্ত, নিত্য সাধনারত থেকে, বালানন্দ মহারাজের দেহত্যাগের পর শ্রীগুরুবিরহে আর আশ্রমের ভিতর পদার্পণ করতে না পেরে আশ্রমের ঠিক দুয়ারের কাছে সন্তোষ আশ্রমে সংসারী হয়েও সন্ন্যাসীর মত আজীবন কাটিয়ে গেছেন: তিনিই আজ অল্প কিছুদিন দেহ রেখেছেন। ভক্তবিরহ যে কী

জিনিষ শ্রীশ্রীবিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী তাঁর একটি শিষ্যের প্রশ্নে কিছু বলে গেছেন। শিষ্যটি প্রশ্ন করেছিলেন, "যাঁরা জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ, কারো জন্যেই কি তাঁরা শোক যন্ত্রনা পান না?" গোস্বামী প্রভু বলেছিলেন: "হাঁ খুব পান। ভক্ত বিচ্ছেদে তাঁরা যে জ্বালা ভোগ করেন তার আর কোথাও তুলনা হয় না। আত্মার সহিত যাঁহাদের সম্বন্ধ জন্মে তাঁদের বিচ্ছেদে যে যন্ত্রণা সাধারণ লোকের সাধ্য কি যে, তাহা কল্পনা করে। সে জ্বালার আঁচও সাধারণের সহ্য করবার সামর্থ্য নাই। সে অতি বিষম। মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের পর, রূপসনাতনাদি অন্তরঙ্গ ভক্তদের বাইরে কোনরূপ শোক চিহ্ন না দেখে অনেকের মনে সংশয় জেগেছিল যে,এঁরা আবার কিরূপ ভক্ত। একদিন একটি বৃক্ষতলে ভাগবত পাঠ হচ্ছে, সকলেই পাঠ শুনছেন। হঠাৎ ঐ বৃক্ষের একটি শুষ্ক পত্র রূপ গোস্বামীর গায়ে পড়লো। পাতাটি গায়ে পড়ামাত্র দপ্ করে জ্বলে উঠলো। তখন উহা দেখে সকলে বুঝতে পারলেন মহাপ্রভুর বিরহ অগ্নিতে তাঁর ভক্তগণ কি প্রকার দগ্ধ হচ্ছেন।"

(শ্রীশ্রীসদ্গুরু সঙ্গ, কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী)

মামাবাবুর দেহত্যাগের পর মহারাজ বিরাট একটা অনুষ্ঠানের উৎসবে এই প্রথম আশ্রমে এসেছেন। এখানকার আকাশে, বাতাসে, আলোকে, প্রতিধূলি রেণুতে কি সেই চিরবিরহের, চিরমিলনের অমৃত আস্বাদ তাঁর মনকে অন্তর্লীন করে রেখেচে? কি জানি আমাদের ছটাকে বুদ্ধিতে আমরা

কী বুঝব? বুঝতে বিশেষ ইচ্ছাও করেনা, তাঁকে যে ভাবে যে অবস্থায় দেখি সমস্তই মধুর হতে মধুরতম মনে হয়।

পূর্ণাহুতির পরের দিন, ধূলোট কুঞ্জভঙ্গ। অজিত আর অসিতকে পুরোধা করে সকল ভক্তেরা মৃদঙ্গ করতাল নিয়ে কীর্ত্তন গাইতে গাইতে ভোর বেলা থেকে সারা আশ্রম পরিক্রমা করে হরিমণ্ডপে এলেন। এখানে যুগলমূর্ত্তির সামনে মহারাজ নিজেও ভক্ত সঙ্গে পরিক্রমা করে হরিনাম করবেন। এ বছর নিজে তিনি বিশেষ গাইলেন না। যে দু'এক চরণ গাইলেন, গলা একেবারে ভেঙ্গে গেছে। ভক্তেরাই বেশির ভাগ গাইলেন। কলকাতার বিজন বাবু ডাক্তারকে ইঙ্গিতে আহ্বান করে মহারাজ কি একটি গান গাইতে বললেন। বিজনবাবু গাইলেন:

"আজুরে, গৌরাঙ্গের মনে কি ভাব হইল।
আপনার পাযে গোরা আপনি ধরিল॥
আজ ভাব নিধির ভাব হয়েছে ·······"

পরে বিজনবাবু নর্ম্মদার ধারে বেড়াতে যেয়ে বললেন, যজ্ঞের আগে লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি ফেরত মহারাজ যখন কলকাতায় এসে ১নং রোল্যাণ্ড রোডে অবস্থান করছিলেন তখন সেখানকার কীর্ত্তন সভায় একদিন এই গানটি বিজনবাবু করেন, শুনতে শুনতে মহারাজের ভাব হয়েছিল।

আমরা তন্ময় হ'য়ে বিজনবাবুর গল্প শুনছিলাম। কি জানি "ভাব নিধির ভাব হ'লে" যে, কেমন হয় তা যাঁরা স্বচক্ষে

দেখেচেন তাঁরা কত ভাগ্যবান। মহারাজ কীর্ত্তন সভায় ভাব-নিমীলিত নেত্রে যখন গান করেন তখন বেশ স্পষ্টই বুঝতে পারা যায়, একটা রোদন সমুদ্রকে তিনি তাঁর অসীম শক্তির অঙ্গুলী সঙ্কেতে যেন স্তব্ধ করে রেখেচেন। কত সময় তাঁর কমল আঁখি জল ছল ছলকরেও মহাশক্তির ইঙ্গিতে স্তম্ভিত রয়ে গেছে। তখন তাঁর দিকে নিমেষ হারা হয়ে চেয়ে থেকে শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের একটি চিঠির কথা আমার প্রায় মনে পড়ত। শ্রীকৃষ্ণ প্রেম (রোনাল্ডনিকসন্) লিখেছিলেন ঃ

"Sree Chaitanya, returning from Gaya was unable to teach in his school ; he was overcome by emotion when anything suggested Krisna ; but I think nevertheless that there is a further stage when he would have been able to teach in his school better than ever before.

The first stage is like the Niagra dashing impetuously in glory from the cliff ; the second is the same water flowing through great pipes and mighty turbines which supply a continent with power. No splash of glory but a low vibrating hum of wondrous power in control."

"শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব গয়া থেকে এসে কৃষ্ণপ্রেমে এতদূর বিহ্বল হ'য়ে গেছিলেন যে তিনি আর তাঁর চতুষ্পাঠিতে পঠন

পাঠন করতে পারলেন না। বললেন, আমি যা কিছু করতে যাই যা কিছু পড়তে যাই সব সময় দেখি "কৃষ্ণবর্ণ শিশু এক মুরলী বাজায়।" এ একটা অবস্থা কিন্তু আমার মনে হয় আরও এর পরে একটা অবস্থা আছে যখন গৌরাঙ্গদেব তাঁর বিদ্যাভবনে পূর্ব্বের চেয়েও অনেক উৎকৃষ্ট করে পঠন পাঠন করতে পারতেন। প্রথম অবস্থাটা হচ্ছে উচ্ছ্বসিত জলধারা উদ্দাম বন্যার স্রোতে ছুটেছে, তাকে রোধ করবার শক্তি নাই।

দ্বিতীয় অবস্থাটা হচ্ছে নায়েগ্রা প্রপাতের অধীর জলোচ্ছাসকে একটা সুসংহত জলপ্রণালীর মধ্যদিয়ে চালনা করে ঐ বিরাট শক্তির সুসংবদ্ধ ক্ষমতায় একটা গোটা মহাদেশকে কল্যাণে অভিষিক্ত করা।" মহারাজ যে অবস্থায় আছেন তাতে শ্রীভগবানের নাম বা প্রেমের একটুমাত্র উচ্চারণ করলেই তিনি ভাবস্থ হ'য়ে পড়বেন, কিন্তু জনকল্যাণের জন্য জীব উদ্ধারের জন্য তিনি মনকে নামিয়ে রেখেছেন। অসীম ভাব-রাশিকে সংবরণ করে বিশ্ব কল্যাণের কাজে নিযুক্ত করেছেন।

মহাপ্রভু যিনি একসময় চতুষ্পাঠিতে সামান্য পাঠ দিতে যেয়েও ভাবসংবরণ করতে পারেন নি তিনিই আবার আর এক সময় জীব কলাণের জন্য নিভৃতে বসে' শ্রীরূপ সনাতনকে ভক্তিরস সমুদ্রের দিগ্দরশন শিক্ষা দিয়েছিলেন। তখন নিজেকে আবিষ্ট হ'তে দেননি। তবুও যিনি "ভাবনিধি" তাঁর ভাব যখন বাধা মানে না, সে কী অমরাবতীর রাজ্যে নেমে আসে এই মরলোকে, যাঁরা দেখেছেন তাঁরা ধন্য। এবার যজ্ঞে

অসম্ভব ভীড় হয়েছিল, তাই পূর্ণাহুতির পরেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সকলে চলে আসবার জন্যে তৈরী হচ্ছেন। আজ বারোটার সময় মোটর বাসে ভাগলপুর থেকে যাঁরা এসেছিলেন, আমার মা বাবা ভাই বোন সকলে চলে গেলেন। তাঁদের বিদায় দিতে গেটের কাছে দাঁড়িয়েছিলাম। ফাল্গুনের একেবারে শেষ। গাছের শুকনো পাতা ঝরে পড়েছে। এই গেটের একটু পরেই আশ্রমের তোরণ-দ্বার। এখান থেকেই একটা অদ্ভুত সুগন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। হোমের পুণ্য গন্ধ, ধূম, ফুলমালা, চন্দন সমস্ত একত্র করলে কি এমনই গন্ধ হয়। এ গন্ধ যে কি, বিশ্লেষণ করে বোঝান যায় না। মহারাজ যেখানে যান সেখানে এমনই এক অপূর্ব্ব সৌগন্ধ পাওয়া যায়। ভাগলপুরে, ক'লকাতায়, পাকুড়ে মহারাজের কাছে যেখানে যেখানে গিয়েছি, যে বাড়ীতে মহারাজ অবস্থান করেন সে বাড়ীর তোরণ দ্বারের মধ্যে প্রবেশ করলেই এই সুগন্ধ পাওয়া যায়। তারপর যখন তাঁর ঘরের সমুখে এসে দাঁড়াই তখন চেতনার সমস্ত স্তর এই দিব্য গন্ধে ভারাক্রান্ত হ'য়ে থাকে। মহাপ্রভু যে দমনক পুষ্পের মালা পরতে ভালোবাসতেন এ কি সেই ফুলের অপূর্ব্ব দিব্য গন্ধ! মোটর বাস যাত্রীদের নিয়ে চলে গেল। মহারাজের জয়গান ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত করে ভাগলপুরের যাত্রীদল চলে গেলেন।

বিদায়ের বিষণ্ণতা এখন থেকেই মনে ঘনিয়ে এসেছে। এই স্বর্গলোক থেকে এবার আমাদেরও বিদায় নিতে হবে।

আর একটি দিন পরেই আমরাও ট্রেনের পথে চলে যাব।······ আজ রাত্রির কীর্ত্তন দেওঘরের উইলিয়ামস্ টাউনে সরকার বাড়ীতে হবে। মহারাজ নিমন্ত্রণ নিয়েছেন। আজ বিকেলের গাড়ীতে আমরা বীরভূম ফিরে যাব স্থির করেছিলাম কিন্তু মহারাজ যখন আশ্রমের বাইরে কীর্ত্তনের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন তখন হয়তো নিজে গান করবেন। তাঁর গলার স্বর শুনিনি এবারে গানের মধ্যদিয়ে, যদি আজ রাত্রিতে শুনতে পাই সেই লোভে রয়ে গেলাম। ঠিক করলাম পরের দিন ভোর পাঁচটার গাড়ীতে যাব। আর একটি দন মাত্র সময় তারপরেই এখান থেকে কতদিনের মত বিদায় তা কে জানে? আশ্রমে খুবই কম আসা হয়। উইলিয়ামস্ টাউনে সন্ধ্যা সাতটার মধ্যে সকলেই এসে পৌঁছেচেন। চমৎকার কীর্ত্তনের আসর সাজানো হয়েছে। সেই ফুলময় তাঁর আসনের চারি-পাশে ব'সে আমরা উদ্বেল হৃদয়ে প্রতীক্ষা করছি কখন তিনি আসবেন। এমন সময় আশ্রম থেকে খবর এ'লো ট্রাষ্টিদের মীটিং হচ্ছে, সেটা শেষ না হলে মহারাজের আসা সম্ভব নয়। যদি তিনি আসেন, আটটার পর আসবেন। অপেক্ষা করে রইলাম। এই কীর্ত্তনের আসরে পুরীর "সন্ধ্যামা"র সঙ্গে আলাপ হলো। ফ্ল্যাগ ষ্টাফে তাঁদের সমুদ্রের ধারে "সরলা নিকেতন" নামে বাড়ীতে মহারাজ এবার রথের সময় উঠে-ছিলেন। সেই সময়কার নানা গল্প সন্ধ্যা করলেন। এবারকার রথযাত্রার তিন চারদিন আগে থেকে মহারাজ কিছুতেই ভাব

সংবরণ করতে পারেন নি। সন্ধ্যা মা বললেন: "সেদিন আমার একটি মেয়ে কীর্ত্তনের আসরে রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইছে, মহারাজ তবু আপন মনে বলেই চ'লেছেন, গাও, গাও। তাঁর সে বলা আর থামছে না। আমার মেয়ে অবাক হয়ে গেছে। সে তো গান গেয়েই চলেছে তবু কেন মহারাজ অবিরাম গাও, গাও বলে যাচ্ছেন। মেয়েটি ভয় পেয়ে গান থামিয়ে দিলে। আমরা এসে দেখি মহারাজের নয়ন দিয়ে অবিরাম ধারা পড়চে। নিজের হাতে নিজের জটা ছিঁড়ে ফেলচেন। খুব একটা অস্থির ব্যাকুল ভাব। শেষে আসনের উপরেই তিনি শুয়ে পড়লেন। অজিত প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরে নামগান করবার পর একটু সুস্থ হ'য়ে ঘরে চলে গেলেন।"

সন্ধ্যা মার মুখে শুনে কতদিন আগে মহাপ্রভুর কথা মনে পড়ছিল। মহাপ্রভুও ভাবের অধীরতার সময়ে এই রকম অবিরাম "বোল" "বোল" বলতেন। শ্রীচরিতামৃতে আছে কোন একটি পদ গাইবার সময়—

"বোল" "বোল" বলেন প্রভু বাহু তুলিয়া
হরিধ্বনি করে লোক আনন্দে ভাসিয়া।"

সন্ধ্যা মাকে বললাম, তিনিই যে আবার এসেছেন, তাই আপনার মেয়ে আধুনিক রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইছিলেন তাতেও কিছু আসে যায় না। মহারাজ যে অনন্ত ভাবসাগরে ছিলেন সেই ভাবের সুধাসিন্ধু হয়তো সঙ্গীতের সুরে উদ্বেল হয়েছিল, তাই মহাপ্রভু যেমন ভক্তদের ভাবানুরূপ কোন পদ গাইতে

শুনলেই অবিশ্রান্ত "বোল" "বোল" বলতেন, শ্রীচরিতামৃতে আছে :

"রাসে হরিমিহ বিহিত বিলাসম্
স্মরতি মনো মম কৃতপরিহাসম্ ॥
স্বরূপ গোসাঞি যবে এই পদ গাইলা, উঠি প্রেমাবেশে
প্রভু নাচিতে লাগিলা।...একেক পদ পুনঃ পুনঃ করায় গায়ন।
পুনঃ পুন আস্বাদয়ে বাড়য়ে নর্ত্তন ॥ ..
'বোল বোল'বলি প্রভু কহে বার বার,না গায় স্বরূপ গোসাঞি শ্রম দেখি তাঁর ॥
'বোল বোল' প্রভু কহে ভক্তগণ শুনি।
চৌদিগে সবে মিলি করে হরিধ্বনি ॥"

তিনিও তেমনি আপনার মেয়ের গান শুনে "গাও" "গাও" বার বার বলছিলেন। দেখুন আমাদের মনে হয় শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর সঙ্গে নিত্যানন্দ প্রভু অঙ্গাঙ্গী জড়িত হয়ে মহারাজের মধ্যে প্রকাশমান।

জানেন তো কথামৃতে আছে, 'খাদ নইলে গড়ন হয়না' সা রে গা মা ছেড়ে একেবারে 'নি' পর্দ্দায় সব সময় থাকলে গান হয় না। কিন্তু মহাপ্রভু নেমে আসতে আর পারেন নি তাই শ্রীনিত্যানন্দকে ডেকে বিরলে বলেছিলেন :

"নিতাই জীবকে হরিনাম বিলাইতে
উঠিল ঢেউ প্রেমনদীতে
সেই তরঙ্গে আমি এখন ভাসিয়া যাই।
যে ব্যথা আমার অন্তরে,
এমন ব্যথিত কেবা? কব কারে?

জীবের দুঃখে আমার হিয়া বিদরিয়া যায়।
জীবেরে সদয় হয়ে, হরিনাম লওযাও গিযে
যাও নিতাই সুরধুনী তীরে।

সব জীব হৈল অন্ধ, কেহত না পাইল হরিনাম
এক নিবেদন তোরে, নযনে দেখিবে যারে
কৃপা করে লওযাইবে নাম।····

মহারাজের মধ্যে এই দুই শ্রীপ্রভু একী ভূত হয়ে গেছেন। কলকাতার রোল্যাণ্ড রোডের কীর্ত্তনের আসরে আমাকে একটি মেয়ে প্রশ্ন করছিলেন, মহারাজের শ্রীগুরুদেব শ্রীশ্রীবালানন্দ মহারাজ কৌপীন মাত্র পরে থাকতেন কিন্তু মহারাজের কেন এত পট্টবাস এত অলঙ্করণ এত রত্নাঙ্গুরীয়, দশ আঙ্গুলে দশটিরও বেশী এত বিলাসিতা কেন ?······

সন্ধ্যা মা বাধা দিয়ে বললেন, আমার নিজেরই তো কথা। প্রথম যখন মহারাজকে দেখি পুরীতে আমার বাড়ীর সামনে বেড়াচ্ছেন তখন তাঁর সাজসজ্জা দেখে মুখ ফিরিয়ে চলে যেতাম ফিরে চাইতামনা। মনে হোত একা সাধু!

বললেম, আপনি বলবেন না ওকথা। আপনি যে মহারাজকে কত ভালো বাসেন আপনার চোখ মুখ তার সাক্ষ্য দিচ্ছে।

সন্ধ্যা বললেন, সে তো এখন। আমি আগেকার কথা বলছি। মহারাজ কখন কাহাকে কি ভাবে ভেঙ্গে চুড়ে গড়েন তা আগে থেকে বলে কার সাধ্য ? কিন্তু আপনি সে মেয়েটির

প্রশ্নের কী উত্তর দিয়েছিলেন ? আমি বললেম তাঁকে, আমার কি সাধ্য যে আপনার প্রশ্নের উত্তর দিই। আপনি নিজেই মহারাজকে জিজ্ঞেস করবেন। তবে আমাদের বিশ্বাস মহারাজের আহার বিহার, সাজ সজ্জা, চলা ফেরা এমন কি প্রত্যেকটি নিঃশ্বাস অবধি বিশ্বজনের কল্যাণের জন্যে সম্পূর্ণ উৎসর্গীকৃত। তিনি হাতের পাঁচ কিছু রাখেন নি। নিঃশেষে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন। আমি আর আপনার কথার কি উত্তর দেব, যখনই মহারাজের দিকে চাই এত কষ্ট হয়। কেবল বাইরের অঙ্গুরীয়গুলি আমাদের চোখে পড়ছে কিন্তু ঐ যে মহারাজের শ্রীঅঙ্গ কেবলই অস্থিসার, এত অস্থিমাত্র সম্বল যিনি, তিনি রোজ সাতঘণ্টা আটঘণ্টা সঙ্কীর্ত্তন করছেন কেমন করে সেটা কি আমাদের চোখে পড়ে না ? চরিতামৃতে মহাপ্রভুর বর্ণনায় আছে ঃ

> "কলার শরলাতে শয়ন, ক্ষীণ অতিকায়।
> শরলাতে হাড় লাগে ব্যথা লাগে গায়॥"

মহারাজ ঠিক সেইরকম অস্থিচর্ম্ম সার। এত যে পট্টবস্ত্র একটার উপর একটা তার উপর আর একটা কেবলই জড়িয়েছেন তবু কি সেই শ্রীঅঙ্গের একান্ত কৃশতা গোপন করতে পেরেছেন ? আমাদের মনে হয় মহারাজের ভিতরে শ্রীমন মহাপ্রভু। সেখানে তিনি কৌপীন ধারী, সেখানে তিনি নিদ্রাহীন, আহারহীন। সেখানে তাঁর অতি দীর্ঘ শ্রীঅঙ্গ এতই অস্থিসার যে, "কলার শরলায় অস্থি লাগে, ব্যথা লাগে গায়।"

আর তাঁর বাইরে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু। অবিশ্রান্ত গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে ধনী, মূর্খ, নীচ, দরিদ্র পতিত, সকলকে অযাচিত নাম দানে উদ্ধার করছেন। নিত্যানন্দ প্রভুর চরিতামৃতে এই বর্ণনা আছে:

"তবে মহাপ্রভু নিত্যানন্দ কথো দিনে।
অলঙ্কার পরিতে হইল ইচ্ছা মনে॥
ইচ্ছামাত্র সর্ব্ব অলঙ্কার সেই ক্ষণে।
উপসন্ন আসিয়া হইল বিদ্যমানে॥
সুবর্ণ রজত মরকত মনোহর।
নানাবিধ বহুমূল্য কতেক প্রস্তর॥
মণি সুপ্রবাল পট্টবস্ত্র মুক্তাহার।
সুকৃতি সকলে দিয়া করে নমস্কার॥
কথো বা নির্ম্মিত কথো করিয়া নির্ম্মাণ।
পরিলেন অলঙ্কার যেন ইচ্ছা তান॥
দুই হস্তে সুবর্ণের অঙ্গদ বলয়।
পুষ্ট করি ধরিলেন আত্মইচ্ছাময়॥
সুবর্ণ মুদ্রিকা রত্নে করিলা খিচন।
দশ শ্রী-অঙ্গুলে শোভা করে বিভূষণ॥
কণ্ঠে শোভা করে বহুবিধ দিব্য হার।
মণিমুক্তা প্রবালাদি যত সর্ব্বসার॥"

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কথা বলতে গেলে মহাপ্রভুও নিজেকে সংবরণ করতে পারতেন না, তাঁর চোখে জল এসে পড়ত। কারণ নিত্যানন্দ হচ্ছেন "কৃষ্ণ সেবা।" কৃষ্ণ সেবা তাঁর

চিন্ময়বিগ্রহে শরীরী হয়েছে। 'ছত্র, পাদুকা, শয্যা, উপাধান বসন, আরাম, আবাস, যজ্ঞসূত্র, সিংহাসন এই দশদেহে তাঁর কৃষ্ণসেবা। তাই নিত্যানন্দের কৃপা ছাড়া ভগবানের প্রসাদ দুর্লভ হতে ও সুদুর্লভ। কারণ শ্রীকৃষ্ণ যদি সাক্ষাৎ দরশন দেন তবু তাঁর সেবা না করতে পারলে আমরা শুধু তাঁর দর্শন পেয়ে কী করব? জীবের স্বরূপ নিত্যকৃষ্ণদাসত্ব। দাস যে, সে প্রভুর সেবা যদি না করতে পায় তবে তার অস্তিত্বের সার্থকতা কোন খানে? কৃষ্ণসেবা আমরা ক্ষুদ্র জীব আমরা কি করে করব? যদি না তাঁকে দিব্য বসন, দিব্য ভূষণ, দিব্য মাল্য,দিব্য নৈবেদ্য, নিবেদন করতে পারি? মহারাজ যদি মহাপ্রভুর মত ছিন্ন কন্থা ও কৌপীন নিয়ে গম্ভীরায় দিব্যোন্মাদ অবস্থায় থাকতেন তাহলে তাঁর সে অবস্থা না হয় রায় রামানন্দ, স্বরূপ দামোদর শিখি মাহাতী ও মাধবী দাসীর মত সাড়ে তিনজন মহাঅধিকারী ও মহাপাত্র বুঝতে পারতেন। কিন্তু তাহলে আমাদের মত শত সহস্র অভাজন নরনারীর দশা হোত কি? আমরা কি করে কৃষ্ণসেবা করতাম? কৃষ্ণসেবা বলতে আমাদের মনে যা বোঝায় চিন্ময় রতন অঙ্গুরীয়, শ্যামপট্টবাস, পীত উত্তরীয়, মালতী বকুল যুথী জাতির মালা, মহারাজ ঠিক তাই গ্রহণ করে সেই বেশে সেই ছবিতে আমাদের সমুখে দাঁড়িয়েছেন।

এমন সময় চারিদিকে শাঁখ বেজে উঠলো, পুরস্ত্রীরা উলুধ্বনি দিয়ে দীপ ধূপ মাঙ্গলিক সাজিয়ে মহারাজকে বরণ করে নিতে এলেন। মহারাজ এসেছেন। আশ্রম থেকে তাঁর

মোটর এসে গেটের কাছে দাঁড়িয়েছে। সেই দিব্য সুগন্ধ, দিব্য বেশ দিব্য মাল্য ভূষিত হয়ে মহারাজ এসে সঙ্কীর্ত্তনের আসরে বসলেন। আমাদের অধীর প্রতীক্ষা সার্থক হোল। আজও মহারাজ নিজে গাইতে পারলেন না। কিন্তু ২।৩ ঘণ্টা কীর্ত্তনের আসরে ব'সে অন্যান্য ভক্তদের গানের সঙ্গে এবং তার নির্দ্দেশ-মত অজিতের সঙ্গে সকলে মিলে যে নাম সঙ্কীর্ত্তন করলেন; সকলের সকল গানের সঙ্গেই করতাল বাজালেন। আগেই লক্ষ্য করেছিলাম মহারাজ এ বৎসর যজ্ঞের সময় খুব ভাবলীন অবস্থায় আছেন। যদিও আজ রাত্রির কীর্ত্তনের আসরে তিনি গান করেন নি, কিন্তু তাঁর মুখভাবে তাঁর মুদিত নেত্রে তাঁর দিব্য উপস্থিতিতে এমন কি একটা বস্তু ছিল যে আমরা সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত হ'লাম। এবার তাঁর কীর্ত্তন শুনতে পাইনি বলে মনে যে ক্ষোভ ছিল তা সম্পূর্ণ দূরীভূত হ'য়ে গেল। কেন সমস্ত মন এমন তৃপ্ত হ'য়ে উঠলো তা কেমন করে বলব। মহারাজ যে উচ্চ ভাবারূঢ় অবস্থায় ছিলেন তার কিছু স্পন্দন তার দিব্য উপস্থিতির দ্বারা চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। হয়তো আমরাও তাতে নিমজ্জিত হতেছিলাম। এ সমস্ত কথা ঠিক লিখে তো প্রকাশ করা যায় না। চিনি খেতে কেমন? না চিনি খেতে যেমন। যখন অনুভব করি বা পাই তখন বুঝতে পারি কি পেলাম। এই প্রসঙ্গে ক'লকাতায় কলকাতার পুলিশ কমিশনার শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত হরিসাধন ঘোষ চৌধুরী মহাশয়ের সঙ্গে কথা-বার্ত্তা হচ্ছিল। তিনি তাঁর গুরুদেব পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীশ্রীবিশ্বজিত

ব্রহ্মচারী মহারাজের সঙ্গে আমাদের দর্শনের সুযোগ করে দিয়েছিলেন। শ্রীশ্রীবিশ্বজিত ব্রহ্মচারী মহারাজ তখন ক'লকাতার খুব কাছেই ছিলেন, ঘোষ দম্পতী খুব ঘন ঘন শ্রীগুরুর সঙ্গ এবং সান্নিধ্য পাচ্ছিলেন। হরিসাধনবাবু বল্লেন, গুরু সান্নিধ্য পাওয়া খুব দরকার। আর তাঁকে একান্তে পাওয়া। পড়েছেন তো শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁর শিষ্যদের কত একান্তে, নির্জ্জনে কত শিক্ষা কত উপদেশ দিয়েছিলেন। দিনে রাত্রিতে, তাঁর শয়নকক্ষে তাঁদের রাত্রিবাসের সুবিধা করিয়ে দিয়ে। রোগ শয্যায় সেবার ছলে তাঁদের নির্জ্জনে পেয়ে, যেভাবে যখন সুবিধা হয়েছে, তাঁদের কত উপদেশ কত গূঢ়তম তত্ত্ব বুঝিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু আপনাদের যেন বড় ভীড়। অত ভীড়ের মাঝে কি কোন কথা হওয়া সম্ভবপর?

আমি বললাম, অত ভীড়ের মাঝে মহারাজের সঙ্গে একটাও কথা হয় না। এই তো এবার ক'লকাতায় ১৫।১৬ দিন তাঁর সঙ্গ করছি এরমধ্যে কেবল একটা কথা হয়েছিল, হাওড়ায় যখন পুরী এক্সপ্রেস এসে থামলো, আমরা ষ্টেশনে গিয়েছিলাম। প্রণাম করবার সময় তিনি হেসে জিজ্ঞেস করছিলেন: "কবে এলে?" তাও আবার এমন একটা সাধারণ কথা যে কোন বিশেষ আধ্যাত্মিক শিক্ষা বা মানেও নেই? নেহাৎ ঘরোয়া প্রশ্ন। তারপর আর একটাও কথা বা উপদেশ দেন নি। ঘোষ মহাশয় হাসলেন। তিনি বহুদিন থেকে সদ্‌গুরু লাভ এবং সদ্‌গুরু সঙ্গ করছেন। অধ্যাত্ম অভীপ্সা এবং লক্ষ্য তাঁর মনে

খুব দৃঢ় আশ্রয় লাভ করছে। কিছুক্ষণ আমরা সকলেই চুপ করে রইলাম। না বলা নানা কথার বাণীতে ঘরের হাওয়া আচ্ছন্ন হ'য়েছিল যেন। শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের কথা ওঠায় মনে পড়ছিল একা তাঁকে দেখলে তো চ'লবে না। শ্রীশ্রীসারদা মা ছিলেন তাঁর সঙ্গে অভিন্ন। তাঁকে শুদ্ধ যুক্ত করে দেখলে তবেই সমস্তটা দেখতে পাব। একবার শ্রীশ্রীসারদা মা'য়ের একটি শিষ্য মাকে প্রশ্ন করেছিলেন: মা, আপনি তো অসংখ্য শিষ্য করছেন। আপনার দীক্ষা দেওয়ার সময় অসময় কালাকাল পাত্রাপাত্র নেই। অহেতুক করুণায় সকলকেই দিচ্ছেন। কিন্তু মা ঠাকুরের শিষ্যদের কত ভাব কত সমাধি হোত, আমাদের তা হয় না কেন? মা একটু গম্ভীর হ'য়ে উত্তর দিয়েছিলেন, "ঠাকুর আর ক'টিকে শিষ্য করেছিলেন? তিনি নানা লক্ষণ দেখে এখানটা একটু টিপে ওখানটা একটু টিপে খুব উচ্চ আধার দেখে আঙ্গুলে গণা যায় এমন ক'টিকে শক্তি দিয়েছিলেন, তা তাতেই তাঁর শরীর এত শীগগীর চলে গেল। আমাকে বলে গেছেন, এখনও অনেক বাকী। তোমাকে অনেক দিন ধরে অনেক করতে হবে।···· হয়তো যাদের আশ্রয় দিয়েছি, সকলের নামও সকল সময় মনে থাকে না। তবু তাদের জন্যে শেষ রাত্রিতে উঠে বসে জপ করি। সবাই তো সব করতে পারে না। সকলের জন্যেই করি। আর যদি কেউ বাকী থেকে যায় তবে ঠাকুরের চরণে প্রার্থনা করি, "তুমি তাকে দেখো।"

আত্মিক জীবনে প্রাকৃত জগতের নামরূপ বা ব্যবহারিক ভাবে তার সঙ্গে ব্যবহার স্মরণ রাখার হয়তো সকল সময়ে খুব প্রয়োজনও হয় না। শ্রীশ্রীমা নিজেই স্বীকার করেছেন : নাম হয়তো মনে নেই, তবু তাদের সকলেরই জন্যে জপ করি, তাদের কল্যাণের জন্যে ঠাকুরের চরণে প্রার্থনা করি।

নীরবতা ভঙ্গ করে হরিসাধন বাবু বললেন, "কিন্তু এই ভীড়ের মধ্যেই অন্তরঙ্গ, বহিরঙ্গ হয়ে গেছে নিশ্চয়। "বহিরঙ্গ সঙ্গে করে নাম সঙ্কীর্ত্তন, অন্তরঙ্গ সঙ্গে করে রস-আস্বাদন।" বললেম, আমাদের এই ছটাকে বুদ্ধি নিয়ে কি করে বুঝব বলুন কে অন্তরঙ্গ কে বহিরঙ্গ। বিশেষ করে ভগবানের কাছে প্রত্যেকটি নরনারী সদ্যোজাত শিশুর মত নির্ম্মল। মহারাজ নিজের মুখেই একদিন একথা বলেছিলেন। এমন ভাবে বলেছিলেন যে স্পষ্টই আমাদের মনে হয়েছিল মহারাজের কাছেও তাই। তাঁর কাছে প্রত্যেকেই শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ, চির নির্ম্মল। সেখানে আগে, পরে, অন্তরঙ্গ, বহিরঙ্গ নেই। তবে যে তাঁকে যেভাবে চায়, যতটুকু চায় যেমন করে চায়, যার যা ক্ষুধা তা তিনি গহন ভীড়ের মধ্যেও কথা না বলেও মিটিয়ে দেন। এমন করে পূর্ণ করে দেন যে, আমাদের মনে আর কোন অসন্তোষ কোন ক্ষোভ কোন অপূর্ণতা থাকে না। তাঁকে "বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়" সর্ব্বদাই ভীড়ের মধ্যে কাজ করতে হয়। ভগবান কি আর কথা না বলে কিছু দিতে পারেন না? তিনি অনন্ত শক্তিমান, সত্যি চাওয়া থাকলে কথা না বলেও

তা মিটিয়ে দেবার শক্তি তাঁর নিশ্চয়ই আছে। আর যারা তা পায় তারা তা বুঝতে পারে। আজও দেওঘর থেকে বিদায় নেবার মুহূর্ত্তে মহারাজের কীর্ত্তন শুনতে না পেলেও সেই পরম ক্ষুধা তাঁর কৃপায় কেমন করে পরিতৃপ্ত হ'য়ে গেল ভাবতে ভাবতে আমরা বিদায় নিলাম। জানিনা আবার কবে তাঁর শ্রীচরণ দর্শন করবার ভাগ্য হবে।

শেষ